শান্তিপুর কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

শান্তি

"সত্যমেব জয়তে"

ছাত্র সংসদ (প্রাতঃ ও দিবা)

১৯৮৪-৮৫

শান্তিপুর কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

শুক্তি

(প্রাতঃ ও দিবা)

★ বার্ষিক সংকলন ★

১৯৮৪-৮৫

ম্যাগাজিন সাব-কমিটি—১৯৮৪-৮৫

পত্রিকা উপ-সমিতি

সভাপতি : ডঃ চুনীলাল কীর্ত্তনিয়া (অধ্যক্ষ, শান্তিপুর কলেজ)

সহ-সভাপতি : আনন্দময় ঘোষ (দিবা), সুমিত বীট (প্রাতঃ)

ছাত্র প্রতিনিধি : বাসুদেব গোস্বামী

পত্রিকা সমিতির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

১। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২। শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার হালদার
৩। ডঃ প্রসূন মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস
৫। শ্রীখোন্দকার আবদুস সালাম
৬। শ্রীউজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়
৭। শ্রীবিমল গোস্বামী
৮। শ্রীশঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্ত্তী
৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১০। শ্রীসর্বদমন ব্যানার্জ্জী

★ সাধারণ সম্পাদক ★

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (দিবা)

মৃণাল মৈত্র (প্রাতঃ)

★ পত্রিকা সম্পাদক—দিবা ★

১। সুব্রত বক্সী
২। গীতা ভৌমিক
৩। সঞ্জয় প্রামানিক
৪। দেবব্রত হালদার

★ পত্রিকা সম্পাদক—প্রাতঃ

১। দেবাশীষ রায় চৌধুরী
২। ভূপেন্দু বিকাশ চৈ
৩। দেবাশীষ সরখেল

★ সহ-পত্রিকা সম্পাদক—প্রাতঃ ★

১। পার্থসারথী দত্ত
২। গৌতম সাধুখাঁ

★ সহ-পত্রিকা সম্পাদক—দিবা ★

১। আব্দুল সাত্তার মণ্ডল
২। ওমর আলি
৩। কৃষ্ণা গাঙ্গুলী
৪। ষষ্ঠীচরণ ঘোষ

★ দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক—দিবা

১। প্রসূন কুমার চক্রবর্তী
২। দেবাশীষ পাল

★ দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক—প্রাতঃ

১। প্রবীর দত্ত

● পত্রিকা উপসমিতির সভ্য ●

অরুণ কুমার তলাপাত্র, দেবব্রত সাহা, অভিজিৎ দাস, পার্থ ঘোষ, প্রদীপ মণ্ডল, রুমা জয়শ্রী বঙ্গ, গৌতম বিশ্বাস, নির্মল দালাল, রতন প্রামানিক, সরোজ পোদ্দার, শম্ভুচরণ শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সুব্রত বিশ্বাস, স্বপন হালদার, রণজিৎ দাস, মিহির কুমার সিংহ রায়, সিদ্ধেশ্বর মানিক সাহা, মনোজ দাস, অরিন্দম ব্যানার্জ্জী, সুশান্ত পাল, তমাল মুখার্জ্জী।

শোক প্রস্তাব

সম্প্রতি শান্তিপুর কলেজের প্রাক্তন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা নীলা চৌধুরী লোকান্তরিতা হয়েছেন। স্বল্প সময়ের জন্য কলেজের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আমাদের চেতনায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের বেদনার সঙ্গে আমরাও আত্মীয় বিয়োগ ব্যাথা অনুভব করছি।

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন—

শান্তিপুর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা (১৯৮৪-৮৫) প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করছি। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা মুকুলিত হবার সুযোগ পায়। গত কয়েক বছরে ছাত্র সংখ্যা যেমন বেড়েছে—তেমনি খেলাধুলা, নাটক প্রতিযোগিতা, পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার সামগ্রিক ফলাফল কলেজকে অনেক সুনাম এনে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে পরপর দুটি ছাত্র কেমিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে—এটাও আমাদের গর্ব। কলেজের আর্থিক সংকট অগ্রগতির বাধা একথা ঠিক। কিন্তু গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে এক লক্ষ টাকা বই ও ল্যাবরেটরীর যন্ত্র ইত্যাদি কেনার জন্য আদায় করতে পেরেছি এবং এতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হয়েছে। গৃহ নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার অনুমোদন পেয়েছি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয় টাকা আমরা পেয়েছি। আগামী ছ'মাসের মধ্যে নতুন গৃহনির্মাণের কাজ শেষ হবে আশাকরি। প্রাতঃ বিভাগে স্বল্প সংখ্যক পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক ছাড়া বাকী সব কাজই আংশিক সময়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীর সাহায্যে চালাতে হয় এবং সেই কারণে ঐ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ছাত্র-ছাত্রীদের সেই অসুবিধার কথা ভেবে দিবা ও প্রাতঃ বিভাগ প্রয়োজন ভিত্তিক আংশিক সময়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত করে অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করে আসছি। এ বছর থেকে ছাত্র সংসদের সংবিধান রচনা ও গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। একাজে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। অদূর ভবিষ্যতে NCC'র একটি ইউনিট খোলার আশা রাখছি। NSS বিভাগটিকে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাধারণভাবে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ ও সংযত আচরণে আমরা খুশী। আমাদের কলেজে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সুসম্পর্ক ও সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ বর্তমান। আমাদের যা কিছু সাফল্য তা ছাত্র-ছাত্রীদের উষ্ণ আন্তরিকতার জন্য সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও জনসাধারণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলেজটির আরও সমৃদ্ধি লাভ করুক—এ কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

———

সহঃ সভাপতির প্রতিবেদন

শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হোল। সুখের কথা, এ বছর নিয়ে আমাদের এই বার্ষিক পত্রিকা দেখতে দেখতে চার বছরে পদার্পন করেছে। পত্রিকা প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল। তার জন্য সবার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিই। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী তাদের লেখার মাধ্যমে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাদের কাছে রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

১৯৮৪ সালের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের যে অকুণ্ঠ সমর্থন শিরোধার্য করে জয়লাভ করেছিলাম, সেই সমর্থন অক্ষুন্ন রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং তার ফলশ্রুতি ১৯৮৫ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছি সহঃ সভাপতি পদে। হয়তো বা বড় মুখ করে বলার মতো কিছু করতে পারিনি, তবুও অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ও তাতে সফলতাও পেয়েছি।

বার্ষিক পত্রিকা, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হাতে যাবার সাথে সাথে আমাদেরও এই সৌন্দর্যময় শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ সমাপ্তি হবে। তাই বিদায়ের শেষ লগ্নে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রত্যাশা করি, তারা যেন সর্ব বিষয়ে কলেজের সুনামকে চারিদিক বিকশিত কোরে তোলে।

সর্বশেষে সকলকে শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করছি।

অভিনন্দন সহ—
সুমিত বিট
বি-কম, ৩য় বর্ষ
(প্রাতঃ বিভাগ)

সম্পাদকীয়

প্রতিবেদন—

অবকাশকে আকাশ বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই, ছাত্রজীবনে মনের জানলা খুলে শীতল হাওয়া উপভোগের 'নাই যে সময়'! কিন্তু প্রকৃতি শ্রীমতী হয়ে চলেছে বন্ধনহীন নিয়মে। বর্ষার মেঘ মেদুরতা, কাশ ফুলের বিলোড়ন, হেমন্তের আবির্ভাব, শীতের কুহেলী যেমন খাঁচার পাখীকে উদাসীন করে, তেমনি ছাত্রছাত্রীর মনকেও করে উতলা।

এই উতলা মন সাহিত্য গড়ে। আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। গড়ে তুলি কথামালা। এই পত্রিকা সেই কথামালাকে আকার দিয়েছে। তাই পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো পূরণ হয়েছে কলকথা দিয়ে। ভুল আছে, ত্রুটি আছে, কিন্তু কলেজের পাঠ চুকিয়ে দেবার আগে আমরা কালির আঁচড় কেটে মুহূর্তের জন্য হলেও কৃতার্থ হতে চেয়েছি।

সবিনয়ে বলি, সম্পাদক হবার যোগ্যতা আমার নেই। অক্ষম সম্পাদক আমি। কিন্তু গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, সকল প্রয়াসকে সফল করেছেন অগণিত ছাত্রছাত্রী, কলেজ পরিচালন সমিতি, সাহিত্যানুরাগী ও অধ্যাপকমণ্ডলী। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন বাহুল্য মাত্র।

পত্রিকা প্রকাশে অনিবার্য কারণে বিলম্ব হল। বিলম্ব হবার জন্য সকলের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি এই 'ক্ষমা' নামঞ্জুর হবে না।

জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন সহ—

সুব্রত বক্সী

গীতা ভৌমিক, সঞ্জয় প্রামানিক, দেবব্রত হালদার।

সহঃ—কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, আব্দুল সাত্তার মণ্ডল,

ওমর আলি, হরিচরণ ঘোষ।

(দিবা বিভাগ)

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার হালদার

ডঃ প্রসূন মুখোপাধ্যায়

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্ত্তী

শ্রীখোন্দকার আবদুস সালাম

শ্রীউজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

শ্রীবিমল কুমার গোস্বামী

শ্রীসর্বদর্শন ব্যানার্জ্জী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শ্রীসত্যব্রত বন্দোপাধ্যায়

শ্রীমৃণাল মৈত্র

শ্রীআনন্দময় ঘোষ

শ্রীসুমিত শীট্

শ্রীবাসুদেব গোস্বামী

শ্রীগোরাচাঁদ সাহা

শান্তিপুর কলেজের সকল অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানাই।

ছাত্র সংসদ (প্রাতঃ ও দিবা)

১৯৮৪-৮৫

প্রকাশক—শান্তিপুর কলেজ ছাত্র সংসদ (দিবা ও প্রাতঃ) ১৯৮৪-৮৫

পরিচালনায়—শান্তিপুর কলেজ পত্রিকা পরিষদ

আলোক চিত্র—ওরিয়েন্ট ষ্টুডিও, শান্তিপুর

অলঙ্করণে—পত্রিকা সম্পাদকবৃন্দ

মুদ্রণ ও বাঁধাই—বেঙ্গল প্রিন্টার্স কাঁকিনাড়া।

॥ ছাত্র সংসদের কার্য-নির্বাহক কমিটি—১৯৮৪-৮৫ ॥

(দিবা বিভাগ)

সভাপতি—
ডঃ চুনীলাল কীর্ত্তনীয়া (অধ্যক্ষ)

সাধারণ সম্পাদক—সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সহঃ সভাপতি—আনন্দময় ঘোষ

মুখ্য সচেতক—
সীতানাথ প্রামানিক

ক্রীড়া সম্পাদক—শিখা কর, জয়ন্ত কুমার গোস্বামী, ইন্দ্রজীৎ গাঙ্গুলী

সহ-সাধারণ সম্পাদক—অরুণ কুমার তপাদার

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক—বিদ্যুৎ দাস, জাহাঙ্গীর হোসেন

সাংস্কৃতিক সম্পাদক—
ওয়াহিদ জামান মণ্ডল, অনিমেষ কুণ্ডু, পীযুষ মুখার্জ্জী, কল্যাণ চক্রবর্ত্তী, শৈবাল দাস

ম্যাগাজিন সম্পাদক—গীতা ভৌমিক, সুব্রত নন্দী, সঞ্জয় প্রামানিক, দেবব্রত হালদার

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক—সুমন চ্যাটার্জ্জী, সুবীর দে, অমিত দেবনাথ, সোমা ইন্দ্র

সহঃ ম্যাগাজিন সম্পাদক—আব্দুল সাত্তার মণ্ডল, ওমর আলি, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ

দরিদ্র ভাণ্ডার সম্পাদক—দেবাশীষ প্রামানিক, মিন্টু মুখার্জ্জী, তরুণ ঘোষ

ইনডোর ক্রীড়া সম্পাদক—অমিতাভ দাস, সাহাবুদ্দিন মণ্ডল, সত্যসরণ সেন, শুক্লা দত্ত

দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক—প্রসুন চক্রবর্ত্তী, দেবাশীষ পাল

লাইব্রেরী ও রিডিংরুম সম্পাদক—অলিক কুমার দাস, অঞ্জন কুমার রায়চৌধুরী, দীপক কুমার ঘোষ

কমনরুম সম্পাদক—গৌরী মল্লিক, অপর্ণা বসাক

ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক—অজয় কুমার সাহা শঙ্কর মিত্র

পঃ জাঃ উঃ জাঃ সংক্রান্ত সম্পাদক—অশ্রু কুমার মৈত্র, নিত্য নারায়ণ সরকার

সদস্যবৃন্দ : আব্দুর রহিম বিশ্বাস, সমরেন্দ্র ঘোষ, অপূর্ব মণ্ডল, বিশ্বজীৎ ব্যানার্জ্জী, মলয় কান্তি রায় সরস্বতী বসু, আলো দে, বৃন্দাবন বিশ্বাস, গৌতম দাস, সুব্রত রায়, গৌতম ভদ্র, রমেশ চন্দ্র সাহা, অনুপমা দত্ত, বিদ্যুৎ কুমার নাথ, রূপা ঘোষ, শ্যামল সেন, অনিতা ইন্দ্র, সুবীর কুমার মুখার্জ্জী, কেয়া প্রামানিক, প্রণয় গুহ, দিব্যেন্দু বিকাশ ইন্দ্র, প্রদীপ দাস, সব্যসাচী কীর্ত্তন, অপর্ণা সাবুই, বিকাশ নন্দী, পুষ্পিতা দেব সরকার, অনুপ কুমার রায়, কৃষ্ণেন্দু প্রামানিক।

॥ ছাত্র সংসদের কার্য-নির্বাহক কমিটি—১৯৮৪-৮৫ ॥

(প্রাতঃ বিভাগ)

সভাপতি—ডঃ চুনীলাল কীর্তনিয়া (অধ্যক্ষ) ; সহঃ সভাপতি—প্রদীপ নাথ

সাধারণ সম্পাদক—মৃণাল মৈত্র ; সহঃ সাধারণ সম্পাদক—দেবব্রত সাহা

মুখ্যসচেতক—প্রশান্ত ব্যানার্জী

পত্রিকা সম্পাদক—দেবাশীষ রায়চৌধুরী, শুভেন্দু বিকাশ দাস, দেবাশীষ সরখেল

দেওয়াল পত্রিকা সম্পাদক—প্রবীর দত্ত ; সহঃ পত্রিকা সম্পাদক—গৌতম সাধুখাঁ, পার্থসারথি।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক—দেবকান্ত ঘোষ, তপন সাহা, প্রদীপ গুপ্ত

অন্দরের ক্রীড়া সম্পাদক—অভিজিৎ মল্লিক

সহঃ সাংস্কৃতিক সম্পাদক : রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সমীর দেবনাথ

দরিদ্র ভাণ্ডার সম্পাদক : অমলেশ মাহাতো, সুব্রত সিংহ রায়

ক্রীড়া সম্পাদক : ইমরান আলী, পার্থ চ্যাটার্জী

সহঃ ক্রীড়া সম্পাদক : মিলন দত্ত।

[illegible]

সূচীপত্র

নং	বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা নং
	সম্পাদকীয়	ক্লাসঃ বিভাগ	১
	াঃ সম্পাঃ দপ্তর থেকে	শ্রীমৃণাল মৈত্র	২
	.. কলম ..	সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
	ধাঁধা	আনোয়ার সাদাত	৭
	কালো কবিকে	দেবাশিস ভৌমিক	৮
	ক্ষমতা লোভী	মদনমোহন পাল	৯
	আমি যা ছিলাম আজও তাই আমি	আবু কালাম খাঁন	৯
	ছোট্ট দুটি কথা	সুমিত বিট	১০
	কারা মারছে ?	শৈলেন মল্লিক	১০
	সাহারার বুকে	দেবব্রত বন্দ্যোঃ	১১
	শোণিত স্রোত	মানস প্রামানিক	১১
	কালো মেয়ের কান্না	রীতা ব্যানার্জী	১২
	সংগ্রামের পথে	আঃ আলিম মণ্ডল	১২
	নির্জন নদীকূলে	চিত্তরঞ্জন মণ্ডল	১২
	ইন্দিরা মহাপ্রয়াণে	মৌসুমী বিট	১৩
	অভাগার বেদনা	শ্রীকান্ত বসাক	১৪
	আমার ছোট্ট গ্রাম	জহির উঃ মণ্ডল	১৫
	নববর্ষ	রতন কুমার দত্ত	১৬
	হতাশা	রতন প্রামানিক	১৬
	এক হওয়ার সঙ্গীত	প্রদীপ রায়	১৭
	দেশজননী	অজয় সাহা	১৭
	স্কুলের আকুতী	রথীন দে সরকার	১৮
	একটি পত্রিকার মুখবন্ধ	রণজিত দাস	১৮

ক্রমিক নং	বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা নং
২৪।	আত্মাহুতি	উমা শঙ্কর দত্ত	১৯
২৫।	বীর আশানন্দ	বঙ্কিম সাধুখাঁ	১৯
২৬।	নিশ্চিহ্ন	কাউছার আঃ শেখ	২০
২৭।	সাক্ষী	অনুরত্না দে	২০
২৮।	শেষ দিন	দিলীপ ভৌমিক	২১
২৯।	বিচিত্র সমাজ	নকুলেশ্বর গোস্বামী	২১
৩০।	ভিখারিনী	মিন্টু মুখার্জী	২২
৩১।	এই শতকের প্রেম	শ্রীশিবশঙ্কর দাস	২৩
৩২।	অধিকার	নিমাই দাস	২৬
৩৩।	শুক্তি লাঞ্ছিত	স্বপন কুমার সাহা	২৭
৩৪।	আমার খেলার---আড্ডেতে	অরবিন্দ মৈত্র	২৮
৩৫।	এন. সি. সি. বিভাগ থেকে বলছি		৩১
৩৬।	চিত্রশিল্পী থেকে বিজ্ঞানী	অজয় পাল	৩৩
৩৭।	আজ কোথায় দাঁড়িয়ে	শ্রীশংকর মিত্র	৩৫
৩৮।	সংস্কৃতের ঐশ্বর্য	উত্তম কুমার সমাদার	৩৭
৩৯।	রবীন্দ্রনাথের গানের---বিপ্লবী	মন্দিরা দে	৩৮
৪০।	বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স কত ?	মঃ আব্দুল্লাহ	৪১
৪১।	ভারতবর্ষ যেন গুজরাট না হয়	সঞ্জয় প্রামানিক	৪৩
৪২।	কুসংস্কারের কবলে দিকপালেরা	অনুপ ঘোষ	৪৬
৪৩।	আমরা কতটুকু স্বাধীন	স্মৃতি দে	৪৮

ক্রমিক নং	বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা নং
৪৪।	ক্রীড়া সংবাদ		৫১
৪৫।	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা – ৮৫		৫৩
৪৬।	সংস্কৃতি সংবাদ		৫৬
৪৭।	পরাজয়	শ্রীউত্তম কুমার ধর	৫৮
৪৮।	নিম্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ	ডঃ অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৯

ক্রমিক নং	বিষয়	নাম	পৃ
৪৯।	আন্তর্জাতিক প্রতিকার	প্রবীর চক্রবর্তী	
৫০।	ইলেকশন	ডঃ ভবানীপ্রসাদ প্রামানিক	
৫১।	ডায়েরীর সেই পাতাখানি	রমাপ্রসাদ চন্দ্র	
৫২।	দাগ	গৌতম সাধুখাঁ	
৫৩।	একটি ফুল	প্রশান্ত দত্ত	
৫৪।	শত্রু	সুব্রত সারথী কর	৭৯

—★—

সম্পাদকীয়

দপ্তর

'তোমার যজ্ঞে দিয়েছো ভার বাজাই আমি বাঁশী'

বিদায়—হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ বিজড়িত ১৯৮৫ সাল। শীতের শুভ্র কুয়াশার বরনালো ভুবিতা ইংরাজী ১৯৮৬ সালকে জানাই আহ্বান। অনেক প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে নবা হাস্যোজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রী ভাই ও বোনেদের হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের কলেজ পত্রিকা-শুক্তি।

প্রতিটি মহৎ প্রচেষ্টার পিছনে কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। অনভিজ্ঞ এই নতুন সম্পাদক তাই প্রতিটি পাঠক পাঠিকার কাছে বিনীত নিবেদন রাখছে—'তাঁরা যেন এই পত্রিকার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন'। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাছেও মার্জনা ভিক্ষা করছি।

অতীতের মতো এই বছরেও পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের কারণ— যথেষ্ট সংখ্যক ভালো লেখার অভাব ও পত্রিকাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রচেষ্টা। এর জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এই পত্রিকা প্রকাশে ও পত্রিকাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে বিসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কাছে ছাত্র-সংসদের ঋণ স্বীকার করছি।

পরিশেষে ভবিষ্যতে পত্রিকা সম্পাদকের কাছে আশা রাখি তারা যেন আরও সক্রিয় ও উদ্যমী হয়ে আমাদের কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করে তুলে এই পত্রিকাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারেন।

জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন-সহ—
দেবাশীষ সরখেল, দেবাশীষ রায় চৌধুরী,
উপেন্দু বিকাশ ইন্দ্র।
গৌতম সাধুখাঁ, পার্থসারথী দত্ত।
(পত্রিকা সম্পাদক)
প্রাতঃবিভাগ।

সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে—

সংগ্রামী প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা,

আপনারা আমাকে বিগত বছরে উজার করা সমর্থন ও ভালবাসা দিয়ে আমাকে [illegible] পরিচালক করেছেন। জানিনা আপনাদের এই উজার উষ্ণ সমর্থনের ঋণ কতটা আমি পরিশোধ [illegible] পেরেছি।

কলেজের সুন্দরী 'শুক্তি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমি আমার কৃতকর্মের হিসাব পেশ [illegible] যাদের সহযোগিতায় আমি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ ও কলেজের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী [illegible] পেরেছি তাদের আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই।

এমন এক মুহূর্তের মধ্যে আমরা শুক্তিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যখন গোটা প[illegible] বঙ্গকে মেকী বামপন্থিরা তাদের অশুভ শক্তির মায়াজালে আবদ্ধ করতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের [illegible] থমকে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার। গ্রামে গঞ্জে আজ সর্বত্র হাহাকার। সাধারণ মানুষের [illegible] অত্যাচার আর অবিচার বাড়ছে। প্রশাসনে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি। যে গণতন্ত্রের জন্য [illegible] অসংখ্য শহীদ প্রাণ দিয়েছেন, সেই গণতন্ত্র আজ ধুলায় লুন্ঠিত। বিচারের বাণী আজ নীরবে নি[illegible] কাঁদছে। সর্বোপরি চরম ক্ষতি হয়েছে এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে। প্রতি মুহূর্তে শিক্ষায় চলছে বি[illegible] এই বিপ্লবের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে গ্রামের পাঠশালার প্রা[illegible] শিক্ষক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে দলীয় তাবেদার নিয়োগ করা যাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ বন্ধক[illegible] রেখে। যুক্তিবোধ ধ্বংস করে তোতা পাখীর মত মার্কসবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের সস্তা বুলি মুখস্থ [illegible] শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের চাপে পড়ে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী তুলে দেওয়া ও সহজ পাঠ বাতিল [illegible] চক্রান্ত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তাতে সর্বনাশ থামেনি! প্রাথমিক স্তরে পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়ে সারা [illegible] ডুবিয়ে দিচ্ছেন অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে। একদিকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক [illegible] চালু করছেন অপর দিকে শিক্ষার আনুষাঙ্গিক জিনিষের দাম আকাশ ছোঁয়া করে দিয়ে মানুষের [illegible] বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ আজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যার প্রতিফল হচ্ছে বিভিন্ন [illegible] সংসদ নির্বাচন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে দিকে দিকে জাতীয়তাবাদী শক্তির [illegible] মেকী বামপন্থীদের পরাজয়।

তাইতো আপনারা একটানা বেশ কয়েক বছর আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন আর সহযোগিতা[illegible] এক সংগঠনের হাতে দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে সংগঠন প্রতি মুহূর্তেই শিক্ষার প্রগতি আর দেশপ্রে[illegible] মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সুখে দুঃখে পাশে থেকে, ছাত্র সমাজের জন্য [illegible] সব সময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ছাত্র সংগঠনের মধ্যে থেকে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে। ছাত্র সংসদের অতীতের ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা অনেক স্বর্ণোজ্জ্বল দিনের কথা দেখতে পাব। বিগত কয়েক বছরের ছাত্র সংসদের ভূমিকা ছাত্র ছাত্রীরা হয়তো একটু বেশী করে মনে রাখবেন। কারণ ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র সংসদের কাছ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা পেয়েছে তাদের দীর্ঘদিনের আশা দাবীর সুষ্ঠু সমাধান। চালু হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স, হয়েছে নতুন ঘরের প্রাপ্তি, হয়েছে ক্যান্টিন, ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে থাকে। দিন, আর কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে। কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে কোন বামপন্থি ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু সৌভাগ্যের কথা সেই চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে উন্নয়ন মূলক কাজ এর মধ্যে দিয়েই সফল ছাত্র সমাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই ছাত্র সংসদে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমার জীবনেও আমি গর্বিত।

এবার আমি আমার কাজকর্মের খতিয়ান পেশ করি। এবার সংসদে প্রবীন হয়ে "সাংস্কৃতিক দুর্গা" উৎসবে আমরা সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক এবং সুন্দরে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ কিরণ চৌধুরী মহাশয় ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে কোন বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি না থাকায় আমরা সকলেই লজ্জিত। আমরা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে নবীন বরণ অনুষ্ঠান ও বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান করেছি, Poor fund এর টাকা বন্টন সঠিক ভাবে হয়েছে।

আমাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতি বেশী সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী স্তরে ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কলেজ হোস্টেল নির্মাণ। লাইব্রেরী সম্প্রসারণ, ল্যাবরেটরী উন্নয়ন, কমার্স বিভাগে ও বাণিজ্য বিজ্ঞানে সাম্মানিক কোর্স চালু ইত্যাদি বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করেছি।

Accountancy to special Honors চালু ও মঞ্চ তৈরী খুব দরকার হবে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এই দাবীগুলোকে করার চেষ্টা করছেন না। আগামী দিনে আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে যে কোন মূল্য দিয়ে আমরা আমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা কলেজের মাঠকে সুন্দর করার জন্য প্রথমে লাঙ্গল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। দ্বিতীয়বার মাঠের এই বাকী কাজ করার জন্য আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ কাজ করতে অনীহা। প্রকাশ করেন তবে এই কাজ আশা করি আমরা এক মাসের মধ্যে শেষ করতে পারবো।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাধারণ সম্পাদক [illegible]

সবাকে আমার সেভাবে এর বছর অতিক্রান্ত হল। অনেক আশা ছিল সবাকে এবার নি-
যুক্ত করব। অনেক দুঃখ, এখনো অনেকটা কাজ বাকী রয়ে গেছে।

তবে আমি বাঙ্লার মতো বলে যেতে চাই, আগামী দিনে আপনাদের সবাকে এ বছরে
ও অপরাজিত শক্তিশালী—এ কথা মনে রাখবেন। কলেজের পরিবেশকে আরও সুন্দর করে
তুলবেন।

জীবনের আমার ভালবাসা জানাই, বিদায় বন্ধু, বিদায় আমার মহাবিদ্যালয়।

অভিবাদন সহ—
শ্রীমৃণাল মৈত্র
সাধারণ সম্পাদক (প্রা

সাধারণ সম্পাদকের কলম থেকে

আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, ভাই ও বোনেরা,

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল একটি বছর—যে বছরের শান্তিপুর কলেজের দিবা বিভাগের সংসদ পরিচালনার দায়িত্ব আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আপনাদের দেওয়া সেই দায়িত্ব কতটা আমি পালন করতে পেরেছি তা জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আপনাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও বিশ্বাসের যোগ্য হবার জন্য আমি সব সময়েই চেষ্টা করেছি। যা করতে পেরেছি তা আপনাদেরই সহায়তায়, আর যা পারিনি তা আমারই অক্ষমতা। আজ 'শুক্তি' প্রকাশের মুখে, আমি আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এই বছরটি ছিল আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছর চিহ্নিত হয়েছিল 'আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ'' হিসাবে। আবার বছরটি শেষ হল আমাদের দেশের মুক্তি দূত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষ হিসাবে। এ দুটির গুরুত্বই আমাদের কাছে অপরিসীম। অপরদিকে এই সময়েই আমরা পেয়েছি এক যুবককে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রূপে। আবার এই বছরেই দেখেছি হিংসা ও হঠকারিতার জঘন্যতম রূপ— কাপুরুষের মত গোপনে অন্ধকারে নিজের ভায়ের বুকে ছুরি চালনার মত 'বীরত্ব' আমাদের চারিদিকে অবাধে চলছে। দেখেছি বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের কারণে অসংখ্য মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে। বছরের শুরুতে গ্যাস দুর্ঘটনার যে কান্নার রোল আমরা শুনেছিলাম তা আজও মিলিয়ে যায়নি।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেখেছি একদিকে দুই বিবাদমান বিশ্বগোষ্ঠী নিরস্ত্রীকরণের নামে পরস্পরের কাছে আসবার চেষ্টা করছে। শান্তি, সৌহার্দ্য আর পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তুলবার জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালাতে, আবার অপর দিকে দেখেছি পরমাণু যুদ্ধের আতঙ্ক সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করতে চলেছে। দেখেছি নিরস্ত্র সমগ্র তামিল জাতি গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেবার জন্য শ্রীলংকার কি সদম্ভ আয়োজন।

যুববর্ষের বাগাড়ম্বরের ফানুস সরে যাওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি বেকারী, দারিদ্র, হতাশা আর বঞ্চনাই যেন আমাদের দেশের যুবক যুবতীদের বিধিলিপি। অশিক্ষা ও বুভুক্ষা যেন সমস্ত যুবমনকে অজগরের মত গ্রাস করতে চাইছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে মেকী রাজনীতিকদের নিজ মতাদর্শ প্রচারের ধ্বংসলীলাও আমরা দেখেছি। আর সেই সুযোগে ধর্মের নামে মৌলবাদী চিন্তাধারার গোঁড়ামিকে রাজনৈতিক স্বার্থে মদত দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। বেকারী দূরীকরণের নামে সাম্রাজ্যবাদের দোসর বহুজাতিক সংস্থা ও

দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে দেশ তথা সমগ্র জাতির সত্তা ও ভবিষ্যৎ তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চে
তাই আজ বিদায় বেলায় আহ্বান জানাই সেই সব যুবক যুবতীদের যারা দানবের সাথে সংগ্রামের
প্রস্তুত হচ্ছে।

এই রকম এক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক স
বিধান সম্ভব নয়। তবুও যেটুকু করতে পেরেছি তা এখানে বলা দরকার। এ বছরে আমরা বা
কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছি। নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানিয়েছি নবীন
অনুষ্ঠানে। আমাদের কলেজের দীর্ঘদিনের কামনা 'দেওয়াল পত্রিকা' আলোচ্য বছরে প্রকাশিত হ
আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষ্যে শান্তিপুর পৌরসভার অন্তর্গত সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের
ছাত্রীদের নিয়ে এক 'মিলন উৎসব' পালন করেছি। সেই সঙ্গে কলেজে আভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্র
(ইনডোর গেমস্) আয়োজনও আমরা করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের জন্য যে 'সহায়তা ত
(Aid fund) আছে তা সুষ্ঠুভাবে বন্টন করতে পারায় আমরা আনন্দিত। সেই সঙ্গে আর
আনন্দের বিষয় হল যে, আমাদের উদ্যোগে বিজ্ঞান রসায়নাগারে যথাবিহিত সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়ে
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের মত পাঠ্য-পুস্তক আমাদের গ্রন্থাগারে পূর্বে ছিল
এই সময়কালেই এগুলি সংগ্রহ হয়েছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কি অপরি
কষ্ট সহ্য করতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। তাই এই বছর সংসদের উদ্যোগে কলেজের ১১ (
১৮ নং ঘর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য ডি
স্তরে ঐচ্ছিক বাংলা (Elective Bengali , প্রবর্তন করা হয়েছে।

এরই সঙ্গে জানাই আমাদের পুরানো সমস্যা যা আমরা আমাদের সময়ে সমাধান করতে পারি
কিন্তু এগুলির আশু সমাধান দরকার। এর মধ্যে রয়েছে কলেজের একটি স্থায়ী মঞ্চ ও দুটি ঘ
নির্মাণ। আজ আমার একথা জানাতে খুবই আনন্দ হচ্ছে যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের এই স
গুলির সমাধানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই ১৯ নং ঘরের সামনে মঞ্চ
১১ নং ঘরের পাশে নতুন ২টি ঘর নির্মিত হবে।

যখন বছরটি শুরু করেছিলাম তখন আমাদের সামনে ছিল আন্তর্জাতিক যুববর্ষের শপথ।
বছর শেষ করার সময়ে শুনতে পাচ্ছি 'মহাবিপ্লবী পরমকারুনিক শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশত বার্ষিকী জ
সব' এর আহ্বান—হিংসা নয় প্রেম, দ্বেষ নয় ত্যাগ, আড়ম্বর নয় ভক্তি। এই মহাপুরুষের সেই
আমাদের অন্তরে আনুক নতুন আলোক, শরীরে আনুন নতুন প্রেরণা।

আজ আমার বিদায় বেলায় আমার নবীন ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনেদের কাছে জানাই আমার বিদায় ভিনন্দন। শত হতাশা, শত বঞ্চনা, শত অন্যায়ের আস্তরণ ভেদ করে নতুন সূর্যের আলোককে নিয়ে আনতেই হবে। মুক্ত চিন্তা আর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তোমরা এগিয়ে চল—চরৈবেতি। মাভৈঃ য় নেই॥ জয় অবশ্যই হবে।

আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের যে হৃদয় ভরা ভালবাসা, মাননীয় শিক্ষকদের যে অফুরন্ত স্নেহ ও সহৃদয়তা, অশিক্ষক কর্মচারীদের যে সক্রিয় সহযোগিতা আমি পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজ দায় নেবার সময়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামার শীল্ডের (Dag Hammer (joeld) এর একটি কথা আমার বার বার মনে পড়ছে—"My pain of lone liness is not due the fact that there is no one elso to share my burden, but to the fact that have only my burden to bear.'

জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন সহ—
সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ (দিবা)

ধাঁধা

বি-এস-সি (প্রথম বর্ষ)

আলোচনার মাধ্যমে

1 'আর পারছি না মশাই, দিন তো একটা বুদ্ধি বাতলে।' কথাগুলো বলে চেয়ারে বসে হাঁপা... লাগলেন মাতকড়ি মিত্তির। তা তো বুঝলাম, কিন্তু সমস্যা কি? মাতকড়ি বাবু বড় ব্যবসায়ী লোক। ... কাজেই গিয়েছিলেন কাশ্মীর, সেই সঙ্গে বেড়িয়ে এলেন। কাশ্মীরের আপেল খুব ভালো লেগেছি... ইচ্ছে হল কিছু খাস কাশ্মীরী আপেল শান্তিপুরে নিয়ে যাবেন। নিজে দেখে শুনে কিনলেন দু হাজার আপেল। তারপর কাশ্মীরের যে ছোকরা তাঁর বাগান দেখে তাকে ভার দিলেন দুটো ট্র... করে আপেলগুলো শান্তিপুরে পাঠাতে। নিশ্চিন্ত মনে শান্তিপুরে ফিরেই 'তার' পেলেন। কা... ছোকরা জানিয়েছে যে আপেল সে পাঠাবে বটে, কিন্তু পৌঁছবে না কেন কি ব্যাপার? কিছু... ঘুষের ব্যাপার। কাশ্মীর থেকে শান্তিপুর যাওয়ার রাস্তায় চেকপোস্ট পড়বে 100টা। প্রতি... চেকপোস্টে পাওনার ট্রাকপিছু আপেল দিতে হবে 100টা করে অর্থাৎ 200 করে আপেল দুটো ট্র... যাচ্ছে। খবরটা খুব ভাল লাগে নি মাতকড়ি বাবুর। অন্ততঃ কিছু আপেল যেন শান্তিপুরে পৌঁ... তার একটা বুদ্ধি চাই। পুরস্কারের কথা ভাবছেন? কেন, সে তো আছেই—কাশ্মীরী আপেল।

2 <u>আমমিনিটের ধাঁধা :</u>

ক)

6	2	12
4	5	20
24	10	?

খ) [নিঃ দ্রঃ—প্রশ্নটা পড়লেই উত্তর বলার জন্য তৈরী হতে হবে – দ্বিতীয়বার পড়া চলবে না]

একটা বাস গ্যারাজ থেকে খালি অবস্থায় বার হল। প্রথম স্টপে 10 জন যাত্রী উঠলো... পরেরটিতে 5 জন নেমে গেলেও 12 জন যাত্রী উঠলো। তারপরেরটিতে 8 জন উঠলো... নেমে গেল 2 জন। পরের বার বাস থামতেই 14 জন উঠলো আর নামলো 9 জন। তার... স্টপে 2 জন উঠলো আর নামলো 1 জন।

[উত্তর তৈরী তো?]

প্রশ্নটা হ'ল : বাসটা মোট ক'বার থেমেছিল?

গ) একই আয়তনের দুটি বেলুন—একটি কালো, অপরটি গোলাপী— হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি করা হ'ল। ভর দুপুরের রোদে দু'টোই ছেড়ে দেওয়া হ'ল আকাশে। কোন্‌টা আগে বেশী উপরে উঠ...

ঘ) তিনদিন আগে ছিল শুক্রবারের আগের দিন, আগামী পরশুর পরের দিনটা কি হবে?

উত্তর :—

1. প্রতিটি চেকপোস্টে মোট 200 টা করে আপেল দিতে হবে। একটা ট্রাক থেকেই যদি দে... শুরু করলে সেই ট্রাকের সব আপেল শেষ হয়ে যাচ্ছে 50টা চেকপোস্ট পার হতেই। ... মাত্র ট্রাকে আপেল থাকছে এবং শর্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় ট্রাক থেকে 100টা করে আপেল বাকী ... চেকপোস্টে দিতে হবে। অর্থাৎ 5000টা আপেল শান্তিপুরে পৌঁছবে। যেহেতু অন্য ট্রাকে আ... নেই, সুতরাং তার জন্যে আপেল ঘুষ দেওয়ার কথাই ওঠে না।

2. ক) 240

খ) পাঁচবার।

গ) কালোটা। কারণ গাঢ় রং-এর জন্য সেটি ভরদুপুরের রোদ থেকে তাপ বেশী শোষণ ক... এবং হিলিয়াম গ্যাস আরও প্রসারিত হবে, ফলে হাল্কা হবে।

ঘ) বুধবার।

কালো কবিকে

—দেবাশিস ভৌমিক
বি-এ, ২য় বর্ষ (বাংলা)

কালো ছেলেটার বাঁশির তালে,
বোবা কোকিলের কণ্ঠে জেগেছিল
বেঁচে থাকার দুর্নিবার আকাঙ্খা।
সুরের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরেছিল
স্তব্ধ জীবনের, গতিহীন অস্তিত্বের,
জমে থাকা রক্তের বীজে বেজেছিল
সৃষ্টির প্রথম গীতি-মূর্ছনা।
যে দীর্ঘশ্বাস অকারণে, সমুদ্রের গানে,
মরুর রুক্ষ ঊষরতার বাস্তবতায়,
হেমন্তের নীল ধূসর সন্ধ্যায়,
নীড়হারা পাখির বুকের ভাষায়।
সেই তুমি আজ একান্তে—
কোন এক অস্তমিত দিগন্তে আছ ঘুমিয়ে,
দিন থেকে সমস্ত আলো শুঁষে
রাত্ত যেখানে বিশ্রাম নেয়।
আফ্রিকার জঙ্গলে ফুল ফুটেছিল—
ওদের ইচ্ছের দড়িতে ফাঁসির গন্ধ,
হৃদয়ে মৃত্যুবিভীষিকার উঁকি ঝাঁকা,
আইনের খাপ ঢাকা ছুরি ওদের মুঠোয়।
সন্তান হারা মায়ের বুকফাটা অশ্রু,
পৃথিবীর নুয়ে পড়া বিরাটত্ব,
নীরবতায় ঢাকা অব্যক্ত হাহাকার
চলমান আশার পথে ক্ষণিকের ছন্দপতন।
কবির ভাবুক আঙুলে যে সুর জেগেছিল
প্রিটোরিয়ার বীভৎস বাতাসে,
তার শেষ রাগিনীর অশ্রান্ত সঙ্গীত
আজও খুঁজে ফিরছে আলোকের ইঙ্গিত;
যে আলো অন্ধকারের ছাড়পত্র।

★★★

ক্ষমতা লোভী

মদনমোহন পাল
বি-এ দ্বিতীয় বর্ষ (পাশ)
রোল নং—১৪৭

আজি দেখ মানসী আমার
ক্ষমতা রয়েছে কত।
বিদ্যার বোঝা স্কন্ধেলয়ে
রয়েছি মায়ারী মত।
পাশে এসে দাঁড়াও আমার
হাতে মেলাও হাত,
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বল
জাগরে ; সুপ্রভাত—
ছিলে পুরাতন, রূপে আজ নূতন
দাঁড়ায়ে সেই রূপবান
বজ্র কণ্ঠে বলতেই হবে
এ কাজ হবে সমাধান॥

জানি তুমি আজ করবে উৎসব,
ক্লান্তির স্বাদ বুকে নিয়ে
নূতন এক জোড় এনে বলবে
ক্ষমতা! রাখবো নাকো ছিঃ
কেন ভীরুতা? কেন দুর্বলতা?
কেন আজ আত্ম সমর্পণ
কেন জান না, মোরা অধিকার
এই ক্ষমতার মুক্তিপণ।
অনুভব কর—চোখ মেলে দেখ—
রয়েছে, লক্ষ কোটি তারা,
ক্ষমতা লোভী ক্ষমতা পেয়ে
দাওনা কেন সাড়া।
জবাব তোমায় দিতেই হবে,
লক্ষজনের মাঝে।
ভূবন মাঝে ক্ষমতা পাওয়া কি
তোমাদেরই সাজে?

আমি যা ছিলাম আজও তাই আমি

আবুল কালাম খাঁন প্রথম বর্ষ বি-এ

আমি যা ছিলাম আজও তাই আছি
আঁধারের ফাঁকা আকাশে মৃত নক্ষত্ররূপে আজও আছি ভেসে
তারকা হয়ে উঠেনিকো জ্বলে
আজও শিশির হয়ে নিঃশব্দে নেমে আসি সবুজ ঘাসে
বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে নিকো তোমার চোখের জলে
আজও সুরভী হয়ে আছি ফুলের পরাগে পরাগে
পাপড়ি হয়ে দেইনিকো রূপ মেলে
আজও দোয়েল হয়ে গান গাই গাছের ডালে ডালে
খঞ্জনা হয়ে নাচে নিতো কভু মেঘলাকাশে
শুধু লোকের কাছে অনেক খারাপ হয়ে গেছি
আমি যা ছিলাম আজও তাই আছি।

"ছোট্ট দুটি কথা"

অমিত্র বিট
বি-কম ৩য় বর্ষ, রোল নং—১৩

সহ-সভাপতির কলমে
লিখছি বড়ই মরমে
কটি মনের কথা,
তিন তিনটি বছর ধরে
মনে প্রাণে কলেজ করে
আজকে আমি পাচ্ছি মনে ব্যথা ॥
শান্তিপুরের এই কলেজে
অশান্তি নেই কারুর কাছে
ছিলাম সবাই কতই না সুন্দর,
পড়াশুনা নিত্য হয়
খেলাধুলা বাদ তো নয়
পবিত্র যে সবারই অন্তর ॥
তাই তো মরমে
জানাই শেষে কলমে
চিরদিনই শান্তি যেনো রয়
আনন্দেতে হেসে খেলে
রয় যেনো সব শান্তি কোলে
মঙ্গলতার বন্যা যেন বয়

কারা মারছে ?

শৈলেন মল্লিক
কলা বিভাগ, (বাংলা অনার্স)
স্নাতক শ্রেণী, (দ্বিতীয় বর্ষ)

জুলাইয়ের সেই বিকেলে
গলিটার মোড়ে একটা নীল শার্টের চীৎকার।
ঝলসিয়ে উঠল সাদা ফণী,
মারো, মারো ।
কে ?
পাশের বাড়িটা বলল—
ঐ তো দোকানের ছেলেগুলো মারছে ।
ডাক্তাররা বললেন—[illegible].
কাগজেরা বললেন—আক্রমণ.
পুলিশ বললেন—দুদলের মধ্যে বেহিসেবী বাচ্চারা.
সাংবাদিক বললেন—আইন শৃঙ্খলা
বলতে কিছু নেই ।
মোম হাতে বক্তৃতামঞ্চে বললেন—জঙ্গলের
রাজত্ব চলছে,
বলতে পারেন জঙ্গল কেন ?
সমাজ বিজ্ঞানী লিখবেন ওরা নয়,
কারা ?

সাহারার বুকে

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
একাদশ শ্রেণী (কলা বিভাগ)

আমি সাহারার সুর বাজিয়েছিলাম,
এক সাহারার বুকে।
তাই বুঝি সুর হারিয়ে গেল,
তন্ত্রী গেল টুটে ॥
আমি অনেক যতনে যে সুর সাধিলেম,
সে সুর গেল মরে।
আমি অনেক যতনে যে তার বাঁধিলেম
সে তার গেল ছিঁড়ে ॥
দিশে হারা হয়ে যে দিকে তাকাই
দেখি তাই মরু চিতা।
সেথা হতে কেবা বল ফিরাইবে,
আছে কে এমন মিতা ?
আমি কি তবে মূঢ়ের মতো,
করেছি শুধুই ভুল।
না জেনে না শুনে সাহারার বুকে,
ফোটাতে গিয়েছি ফুল ॥
সাহারার বুকে কোন দিনও কি,
বাজিবেনা কোন সুর,
তবে কি সেথায় ফুটিবেনা আর,
কোনও একটি ফুল ॥

★

শোণিত স্রোত

বি.এ, কলা বিভাগ
(বাংলা অনার্স) তৃতীয় বর্ষ

তোমার বুকের মাঝেতে যে রক্তের স্রোত
অস্তরাগীর ছোঁয়া গোলাপ
পবিত্র শুভ্র স্পর্শহীন
তীক্ষ্ণ ধারা অতিক্রম করে অকস্মাৎ
বসন্তের গোলাপ—
আমাকে ছুঁয়ো না
আপনি দেখো
আমার ঐ নিষ্কলঙ্ক স্পর্শে।
আমার আবেগ জুড়ে
ছড়াবে সুবাস সুবাস।
সত্য বলো আজ তবে
উন্মোচিত কর উষ্ণ গোলাপকে
আমারই উষ্ণ নিঃশ্বাসে।
চঞ্চলতায় মন মন
নিরঙ্কুশ হোক—দীর্ঘায়ু হোক আরও!
লাল গোলাপের স্পর্শে
আমরা পাবো শোণিত ছাপ—
কারণ ? শুভ্র গোলাপ
ছড়াক সুগন্ধি।

★

কালো মেয়ের কান্না

রীতা ব্যানার্জ্জী
বি-এ, (১ম বৎসর)

আজ তোমার চোখে দুফোঁটা জল
টলমল—টলমল—
অপরাজিতার বুকে শুভ্র-শিশির—
আমি চমকে উঠলাম !
এত কালো মেয়ের কান্না !
এ অশ্রু দিনের আলোয় হারিয়ে যাওয়া
নিশির.
তোমার পেলব—অধর অশ্রুতে সিক্ত
বেদনায় রুদ্ধবাক
কেঁপে কেঁপে ওঠে বার বার
কোথায় হারিয়ে গেল হাসির মুক্তো !
বলো কালো মেয়ে
এই ভাল লাগা ভোরে
তুমি কেন চুপ করে আছো
অব্যক্ত যন্ত্রনাকে নিয়ে ?

নির্জন নদীকূলে

চিত্তরঞ্জন মণ্ডল
স্নাতক শ্রেণী প্রথম বর্ষ
বাংলা (অনার্স)

নির্জন নদীকূলে নীরব ক্লান্ত দুপুরে
আমি একা বসে রই ; কেশবতী কোন
রূপসী কন্যা যেন জলের কলসী—
কাঁখে নাই হয়ে—ব্যথিত হৃদয়ে
এ কন্যার কেশের বাহার আর
ঢলে ঢলে কালো আঁখির স্নিগ্ধতায়
আমার মনে জাগে আশা—প্রাণে লাগে
দোলা ; আবার মনে পড়ে বিচিত্র পৃথিবীর
সেই কথা ঃ চারিদিকে অন্যায়ে ভরা
লম্পট হৈচৈ চোর-ডাকাত আর মাতালের ভীড়
বেকারের হতাশা যুদ্ধের দামামা—এরি
মাঝে আমি বসে রই নির্জন নদীকূলে নীরব
ক্লান্ত দুপুরে কোন এক কিশোরীর মনের
আঙিনায় ;

সংগ্রামের পথে

আব্দুল আলিম মণ্ডল
বি-এ, ২য় বর্ষ

এসে ফিরে যাও কেনে দাঁড়াও
রক্ত চোখে লবণের ছিটে দাও
গায়ের আভরণটা খুলে
উলঙ্গ করে দাও
মুখ লুকায় জোনাকীও সুদূর
অন্ধকারে দেখে নিজ স্বরূপটা
এক বিংশ শতাব্দীর নবজাতক
অন্ধকারে পাশাপাশি নিয়ে
এগিয়ে চল সংগ্রামের পথে ।

ইন্দিরা মহাপ্রয়াণে

মৌসুমী বিট
(কলা বিভাগ) দ্বাদশ শ্রেণী

ভারতকন্যা, ভারতের বধূ
ভারতমাতা গো তুমি
তুমি অনন্যা, বিশ্ববরেণ্যা
শ্রদ্ধায় তোমা নমি।
তুমি ভারতের অমরমুকুট
তুমি যে অমর মান
তব দেহ-দিয়ে শেষ দিনটিতে
রক্ত করেছো দান।
তুমি যে মোদের জাতির দেশের
চরম-অহঙ্কার
তোমারি লাগিয়া বিপুল ভরষা
জাগে মনে সবাকার।
মহীয়সী তুমি, গরীয়সী তুমি
উন্নত তব শির
তোমারি প্রয়াণে সারাটি জগৎ
স্তব্ধ, অচল-স্থির।
দীর্ঘ দিনের ভারতবর্ষে
দুর্বলতার ক্ষত
দূর করে দিলে অসুর-দলনী
দুর্গা-মায়ের মত।
ভীরু দীনতার গ্লানিভরা ঐ
জঞ্জালস্তুপ হতে
দেশকে তুলেছ দেশধাত্রী
সোনার দিব্যরথে॥

রক্ষকও যে-ই, ভক্ষকও সে-ই
কি ক্ষতি করিল হায়
কি হবে এখন, ভাবি সারাক্ষণ
দেশ বাঁচানো যে দায়।
চিনিল না তোমা, ক্ষুদ্র স্বার্থে
ওগো দশভুজা তুমি
দেশের লাগিয়া জীবনটি দিলে
নমি ভারতের ভূমি।
ইন্দিরা-মাতা তোমার স্মরণে
গরবের শেষ নাই
কোটীকণ্ঠে তাইতো আজিকে
তব জয় গান গাই।
সূর্য্য তারা সত্যি যেমন
তোমার নামটি তাই
বিশ্বজুড়ে সবার মনে
অমর তোমার ঠাঁই।

"অভাগার বেদনা"

শ্রীশ্রীকান্ত বসাক
বি কম' প্রথম বর্ষ (পাশ)
রোল নং ১৪৬

অভাগা আমি ধরণীর মাঝে, পাইনি কারও স্নেহ
দুঃখে ভরা আমার জীবন, বাসে নাই ভাল কেহ ॥
মনে যাহা কিছু করেছি আমি, এমোর জীবন মাঝে
ভরে নাই কভু-হয়েছে বিফল, ব্যাথা তাই বুকে বাজে ॥
দেখা যায় শুধু রটে অপবাদ, লোক মুখে মুখে মোর
দুঃখের নিশি পোহায়ে বুঝি, হবে নাকো আর ভোর ॥
করিনা আশা এ জীবনে আর, সুখ পাব কোন কালে
দুঃখই বুঝি লেখা আছে মোর, দুঃখেরই এই জালে ॥
প্রাণের শান্তি গিয়াছে চলিয়া, চিরতরে মোরে ছেড়ে
হে ঈশ্বর, কেন তুমি মোর, সুখ রাশি নিলে কেড়ে ॥
অবোধ আমি পৃথিবীর মাঝে, বুঝিনা তোমার লীলা
শত শত ব্যথা হৃদয় জুড়ে, আমারেই প্রভু দিলে ॥
দাও প্রভু যত দুঃখ আছে, সব ঢেলে মোর শিরে
শক্তি শুধু দিও এইটুকু, সহিতে পারি যেন ধীরে ॥

★★★

"আমার ছোট্ট গ্রাম"

জহির উদ্দিন মণ্ডল
বি-কম (২য় বর্ষ) রোল নং ১০৬

হে আমার ছোট্ট গ্রাম
আমি ভুলিনি তোমার কথা
জন্ম ভূমির স্মৃতি
আমার হৃদয়ে আছে যে গাঁথা।
কত সুন্দর ফলে ফুলে
সজ্জিত আছ যে তুমি,
গ্রাম ছেড়ে এসেছি শহরে
তবু তোমাকে ভুলিবনা আমি।
জ্যৈষ্ঠ মাসের মন মাতানো
আউস ধানের ক্ষেতে
বিকাল বেলার মধুর হাওয়ায়
মন যে উঠিত মেতে।
উদার আকাশে সূর্য যখন
উঠিত পূর্বাকাশে
কৃষক ভায়েরা লাঙ্গল লইয়া
ছুটিয়া যাইত চাষে।
নানা রকমের পাখিরা গাহিত
বসিয়া বৃক্ষের ডালে
রাখাল বালক বাজাইত বাঁশী
সুর দিয়ে তালে তালে।
ফাগুন মাসের আগুন হাওয়া
জোয়ার আনিত মনে।
গুঞ্জন করি ভোমর আসিত
ফুল ফোটা বনে বনে
নব বসন্তে আম্র কাননে
মৌমাছির ঝাঁকে ঝাঁকে
ভিড় করিয়া থাকিত যাও
মুকুলের মধু পানে।
আবার আসিব ফিরে
তোমার বুকেতে,
হে আমার গ্রাম, তুমি
পারিবে চিনিতে ?
তোমার বুকেতে মিলিয়া মিশিয়া
থাকে হিন্দু মুসলমান
আমি ভুলিনি তোমার স্মৃতি
হে আমার ছোট্ট গ্রাম।

"নববর্ষ"

রঞ্জন কুমার দত্ত
(বি-কম) রোল নং ১৬১

নববর্ষের শুভ দিনে
উজাড় করে দিলাম এনে
সকল ভালবাসা,
রইল প্রীতি, ভাল থেকো
মনকে সদা সতেজ রেখো
মিটুক তব আশা।

ভাই তুমি বন্ধু তুমি
জেন অতি তুচ্ছ আমি,
ভালবাসা ছাড়া যে মোর
দেবার কিছুই নাই।

হতাশা

রঞ্জন প্রামানিক
রোল নং ১১৪ (বি-কম, ২য় বর্ষ)

পরশ পাথরে আঁকা
আমি যেন এক নিরুত্তর ছবি
তাই পারি নাকো শুনিতে, নির্মল প্রভাতের
গেয়ে যাওয়া সু-মধুর পাখির গান।
নিঃশ্বাস মোর রুদ্ধ হয়ে আসে
যেন কে ? গলা টিপে মারিতে চায়
কত যে বলেছি 'মুক্তি দাও', ওগো মুক্তি দাও,
বাঁচতে দাও, বিশুদ্ধ কর মোর প্রাণ।
কখনো শোনো নাই মোর কথা—
হে বিধাতা, আমি তোরে বেইমান বলি
সকল মানুষে দিয়াছো ভালবাসা
আমারে দিলে কেন অন্ধকার রাত ?
আমার এ রুক্ষ জীবনে, যদি পেতাম—
এতটুকু করুণা তোমার
হয়তো পারিতাম বাঁচিতে
কেটে যেত নিশার সেই কাল রাত।

"এক হওয়ার সঙ্গীত"

প্রদীপ রায় (বড় ভাই)
বি-কম প্রথম বর্ষ

গাত্র-বর্ণের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম—,
বাঁশীর সুর, জমাট গরমের স্পর্শ।
মনে হলো আর সেই ফুলের সৌরভ ছড়ায়;
তবু, এখনও হৃদয়-দিয়ে অনুভূতি আসে,
আসে নবোদিত সূর্যের প্রস্ফুটিত
রক্তমাখা গোলাপের ঘ্রাণ।
কাব্যের মধ্যে তোমাকে চিনলাম;
চিনলাম অনন্ত শৃঙ্গের শীর্ষে
প্রত্যক্ষ প্রমাণে আবেগী অস্পষ্টতায়।
সঙ্গীতের বিড়ম্বনায়, তাঁবেদার অভিলাষ চাইল—
হে হিমালয়,
        নিদ্রাহীন কন্যাকুমারী,
তোমাকে এক মোহনায় দেখতে—রক্ত দিয়েছে
তোমারই গর্ভজাত সন্তান।
ভুল করে হৃদয় ফেলে দিচ্ছি পশ্চাতে আমরা।
এসো! ফিরে যাই!
সমস্ত দর্প চূর্ণ করে আবেগ ভরা প্রাণে
এক, হিমালয় হতে কন্যাকুমারী!!!

★★★

দেশজননী

[illegible]

[illegible]

ফুলের আকুতী

রথীন দে সরকার
২য় বর্ষ বাণিজ্য বিভাগ

তুলনা তুলনা মোদের
ছিড়ে নিওনা তোমার ডালায়।
আমরাত আছি বেশ সুখে
মুখগুলো তুলে আকাশে
দিনের সূর্য, রাতের তারার দিকে।
প্রাণ ভরে স্নান করি রাতের কুয়াশায়
গল্প করি চাঁদ-তারাদের সাথে।
সূর্যকে ডেকে তুলি প্রতি ভোরে
তোমাদের মুখ চেয়ে তোমাদের তরে।
তারারা যেমন ফুটে আছে নীল গগণে,
পূর্ণ চাঁদ অবাক হয়ে,
সূর্য যেমন সূমুর্যখীর মত চেয়ে
আছে আমাদের দিকে।
আমরাও নানান রঙিন ফুল
তেমন করে ফুটে আছি—
সবুজ ধরণীর বুকে।
চেয়ে আছি অসীম আকাশের দিকে।
অশেষ অনুরোধ করি মালি তোমায়
ছিড়ে আমাদের নিওনা তোমার ডালায়।
কে বলেছে তোমায়
আমরা দেবের চরণের আশায়
ফুটে থাকি।
ওটা ভুল, ওটা মিথ্যা,
আমরা গাছের বংশ বজায় রাখি।
এটাই সত্য চির সত্য।
তাইত শুধু আকুতি করি।
মিতনি করি তোমায়—
ডালায় ভরিয়া আর
নিওনা তুলিয়া, হায়—!

"একটি পত্রিকার মুখবন্ধ"

রণজিত দাস
স্নাতক শ্রেণী (প্রথম বর্ষ) কলা-বিভাগ
ক্রমিক সংখ্যা ১১৪

চিন্তা সাপেক্ষ এবং আবেগাশ্রয়ী
অনুশীলনের প্রশান্ত পথে,
বিস্তৃর্ণ রাস্তাটা মসৃণ করতে
এগিয়ে যাবার স্বল্পাধিকার
লড়াই করে ছিনিয়ে নিতে সচেষ্ট।
ক্ষমাযোগ্য ত্রুটি বিচ্যুতি
সাধারণ মান ছাড়িয়ে—
প্রজ্ঞার তটসীমায় দোদুল্যমান
তবুও সামনে থাকে নৈর্বক্তিক পরীক্ষা।
তুলনার গণ্ডী পেরিয়ে
মহামিলনের সেতুবন্ধনে
দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবার—
মানসিকতাই একান্ত মূলধন॥

আত্মাহুতি

উমাশংকর দত্ত

বি-কম (সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

ভোর হোল,
দূরে গীর্জায় ঘন্টা বাজছে।
১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৫-র ভোর,
ফাঁসির কাঠে গোড়ায় দাড়ালেন
এক বিদ্রোহী কৃষ্ণাঙ্গ কবি
নাম বেঞ্জামিন মলোইজ,
শ্বেত হায়নাদের বুনান দড়ির ফাঁসে
কালো কাপড়ে ঢাকা মাথা ঢোকালেন
দড়িতে টান পড়লো---------।
কেঁপে উঠলো দড়ি---------।
ঝুলে পড়লো বিদ্রোহী কবির নশ্বর দেহ
শেষ হল তার জীবনলীলা অন্ধকার কূপের মধ্যে।
সেদিন গর্জে উঠেছিল সারা পৃথিবী।
প্রত্যেকটি মানুষ ধিক্কার জানিয়েছিল সেই
ফাঁসিকে,
ধিক্কার জানিয়েছিল সেই সাদা চামড়ার—
সেই শয়তানদের।
মুক্তির জন্য মানবতার জন্য প্রাণ দিতে হলো
২৮ বছরের মলোইজকে।
---------কিন্তু এই একটা ফাঁসির দড়ি
থেকে জেগে উঠবে হাজার হাজার
সুপ্ত মলোইজ।
তারা লড়বে সেই মানবতার জন্য,
তারা লড়বে সেই মুক্তির জন্য,
বেঞ্জামিনের এই মৃত্যু আমাদেরকে
স্মরণ করিয়ে দিল যে এই মৃত্যু কত মহান।
ঐদিন থেকেই বেঞ্জামিন আমাদের কাছে
একটা বিদ্রোহ,
একটা জ্বলন্ত প্রতিবাদ
একটা বিস্ফোরণের আগুন
এক ঝাঁক শান্তির সাদা উজ্জ্বল পায়রা।

বীর আশানন্দ

রঞ্জিত সাধুখাঁ

প্রাক্তন ছাত্র

অতীতের কোন্ পুণ্য লগ্নে
আবির্ভূত হয়েছিলে তুমি মানব জাতির ক
হয়েছিলে ব্রত তুমি সৃষ্টির পালন
আর কঠোর হস্তে দুষ্টের দমন।
তোমারই আলোকে আলোকিত—
এই বি
চলেছ তুমি সত্যের সন্ধানে—
নতুন পথে, যেথা নাই কোন ভ
যেথা আছে শুধু সত্যের জয়
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার সাধন—
বহু সাধনায় সিদ্ধ তুমি
করিয়াছ সিদ্ধিলাভ।
বীর আশানন্দ সাধক মহান্।
তোমার চরণে করি কোটি প্রণাম।

"নিশ্চিহ্ন"

কাউছার আলি শেখ
দ্বাদশ শ্রেণী (কলা বিভাগ) ক্রমিক নং ১০৮

অত্যাচারে ব্যভিচারে আজ দিকে দিকে,
বিভেদ বিদ্বেষের ঘনঘটা।
তারই অশান্তির অনলে ধরণী জর্জরিত
ক্ষত বিক্ষত হৃদয় ধুঁকছে।
সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ হয়েছে উদভ্রান্ত দিশেহারা,
শান্তির আঙিনায় নেমে এসেছে ঘোর অমানিশা।
নির্মম কষাঘাতে ছিন্ন হয়েছে মৈত্রী প্রেমের বন্ধন।
সত্যের আদর্শকে করেছে কারারুদ্ধ
আমরা নীরব বাকশক্তিহীন হোয়ে করুনা ভিক্ষা
চাইছি।
কিন্তু কেন ? ওদের প্রাঙ্গনে আমাদের আজি
দু-নয়ন শ্রাবনের বারি ঝড়িয়ে সব শেষ করে দিয়েছি
আজ আর কিছু নেই যা দিয়ে ভেজাব চরণ।
কিন্তু বাবু মহাশয় ? আমাদের সুখীকে শৃঙ্খল
থেকে মুক্তি দেবেনা ?
তোমরা সেই প্রিয়াকে ছিনিয়ে নিয়োছো—
আদিম সভ্যতার কিছুদিন পরে, তোমাদের
শোষনের চাবুকের ঘায়ে।
বলিয়ে নিচ্ছ ? আমি সুখী, আমি সুখী।
এই সুখের অন্তরালে পুঞ্জিভুত হচ্ছে এই দাবানল
তার বিস্ফোরণ সম্মুখীন।
সেই অভিষেকেই হোতে হবে তোমাদের নিশ্চিহ্ন।

সাক্ষী

অনুরত্না দে
বি-এ (অনার্স) ১ম বৎসর

ইতিহাস তুমি অতীত আর বর্তমানের
সমুজ্জ্বল দর্পন—
তোমার পাতায় পাতায় ধ্বনিত হয়
সাফল্য আর ব্যর্থতার ক্রন্দন ও আনন্দ ;
কত লোভ লালসায় অত্যাচারিত মানুষের বুকে
চলেছিল অবাধে অত্যাচার!
হায়, ইতিহাস তুমি-ই যে আজ
নীরব সাক্ষীতার।
দেখালে বহু শত শত অজানা অচেনা পথ,
সেই লক্ষাস্থল সম্মুখে রেখে—
মোরা চলবো দীর্ঘকাল।
যবে স্বাধীনতার ঊষালগ্ন রাঙিয়ে দিয়েছিল
অজস্র মানুষের বিষন্ন মুখ—
শুধু তোমাতেই মুখরিত আছে স্মৃতির গুঞ্জন॥
আজকের এই দিনগুলিও
একদিন হবে অতীত ;
ইতিহাস তুমি ধরে রেখে দিও
আমাদের সকল প্রতিচ্ছবি॥

"শেষ দিন"

দিলীপ ভৌমিক
বি-কম (২য় বর্ষ)

'আচ্ছা' ! তোমার মনে পড়ে—
সেই শেষ দিনটার কথা ?
আরে, সেই শেষ দিনটা ? সে দিনের পর হতে
আমি হারিয়ে ছিলাম প্রিয়তমা তোমাকে ?
চারি দিকে শুধু জল আর জল—
মাঝে শুধু আমরা কয়েক জন প্রাণী
নীরব নিঃস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে আমাদের
কচি তাজা প্রাণগুলি মিলেমিশে '
সব একাকার হয়ে গিয়েছিল
শীতল ছায়ায়, গাছের তলায় শায়িত ছিলে তুমি
মোর বাহু পরে
আবেগ আর উত্তেজনায় ফুটে উঠেছিল
তোমার কপালে বিন্দু বিন্দু 'ঘাম' ।
চুম্বনে চুম্বনে তোমার ওই মিষ্টি মুখের পরে
আমি এঁকে দিয়েছিলাম
আমার ভালবাসার আল্পনা ।
কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছিল নদী
আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল তোমার
অর্ধ নিমীলিত চোখে চেয়েছিলে তুমি,
আমার মুখের পরে, আস্তে আস্তে—
বুজে গেল তোমার দুটি চোখ
আমিও হারিয়ে ছিলাম আমার সম্ভ্রম কে
আজ আমি বড় একা, তাই মনে পড়ে
সেই শেষ দিনের কথা ।

বিচিত্র সমাজ

নকুলেশ্বর গোস্বামী
বাণিজ্য (২য় বর্ষ) রোল নং ৮৬

জানিনা কি মনের ক্ষোভে সেদিন
চলিনু রেললাইন ধরে । উদ্দেশ্য একটিকি
ভবিষ্যতের চিন্তাকরে । হটাৎ ?
অদূরে কোলাহল শুনে, চলে যাই সেখানে
শতকণ্ঠের একটি ধ্বনি—
মার-মার-মার শালাকে সকলেমিলিয়া । মার-
ওরা যে, সমাজের জঞ্জাল,' বলিয়া উঠিলে,
সে
জঞ্জালের মনে প্রশ্ন জাগিল, চেয়ে দেখে
জ
নীরব ব্যথা নিয়ে থাকলে, সকলে টিটকিরি
সকলকে বলিল আর মেরনা, আমি যে মর
আহা সমাজের যষ্টি, বলিয়া উঠল দু
উঠিয়া দাঁড়াইল জঞ্জাল—
রক্তঝরা দেহের—
মলিন পকেট থেকে,
বাহির করিল একখানি লিপি,
দীন-পণ্ডিত ছিলেন তথায়, লিপি পড়ে দে
সপ্তদশকের উচ্চ শিক্ষিত এই জঞ্জাল ।
বাহির করিয়া দিল আরও পঞ্চাশখানি
পড়ে দেখেন সকলগুলি Interview কপি
দীন পণ্ডিত বুঝিয়া নম্র হইল তার মন ।
সস্নেহে মুছিয়াদিল তার দেহ—
ফুঁপিয়া উঠিল মোড়ল, একি পরি
চোখ ফেটে এল শুধু জল—
কিন্তু বলতে পারলাম না,—বন্ধু
আমিও তোমার সাথী ।

"ভিখারীনি"

মিণ্টু মুখার্জ্জী (দরিদ্র ভাণ্ডার সম্পাদক)
বি-এস-সি (প্রথম বর্ষ)
ক্রমিক সংখ্যা—২০

সামান্য একটি পোড়ারুটির জন্য
দাড়াইয়া কাঁদিতেছে এক ভিখারিনী—
বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখ দ্বারে।

প্রচণ্ড ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় ফাটিতেছে তার বুক,
তবুও সে পাইলনা, ভিক্ষা একটি পোড়ারুটি।
ধিক্ বিধাতা তোর নিষ্ঠুর আচরণে!
তুই নাকি অন্তর্যামী, তুই নাকি সর্বহারার
প্রতিমূর্ত্তি।

ভিখারীনির করুণ বাক্যে, আসিয়া জমিদার,
জিজ্ঞাসা করিল তাহারে—কি ভিক্ষা চাস!
সমাজের কলঙ্ক তুই সমাজের কালি,
অশ্রাব্য ভাষায় তারে দিল গালাগালি।

জমিদারের পায়ে পড়ি আবার কহিল,
"ভিক্ষা তুমি দাও মোরে একটি পোড়ারুটি
তাড়াইয়া দিও না মোরে আমি অনাথিনী"
ভিখারীনির কাতরবাক্যে নিষ্ঠুর জমিদারের
হৃদয় না গলিল।

পাষান জমিদারের নিষ্ঠুরতায়, ক্ষুব্ধ হইয়া
ভিখারীনি—
অভিশাপ দিল তারে যাহা মুখে আসি
ভেবেছিলাম এত সুখ সহিবেনা আর;
অভিশাপে সাথী তোর দুঃখ কারাগার।

হইবেনা তোর পূর্ণজন্ম বিধাতাকে আমি কাদি,
যত অন্যায় করিলি তুই ক্ষমা করিবেনা ভবানী।
তুই অশান্ত তুই দুরন্ত এত নিষ্ঠুর কেন,
বিষাদের ছায়া কারুণ্যের মায়া নাহিক মুখছেন।

নয়নের জল ঝরে অবিরল শত সহস্র ধারায়,
পুঞ্জীভূত ব্যথা বেদনা রহিবে হৃদয় খাতায়।
সেদিন এই অনাথিনী থাকিবেনা ধরাধামে,
বিদায় লইয়া চলিব আমি অমৃত স্বর্গধামে।

কটুবাক্যে বিধাতারে রুষ্ট করি তায়,
নিজ ভাগ্যদোষে আমি ভিক্ষা করি তায়।
অন্যায় করিয়াছি, তোমারে করিয়া কষাঘাত,
না বুঝিয়া করিয়াছি ভুল, ক্ষমা করি লও।

এই শতকের প্রেম

শ্রী শিবশঙ্কর দাস
বি. কম. দ্বিতীয় বর্ষ
রোল—51

আজ বিংশ শতাব্দির শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখব পৃথিবী আগের তুলনায় কত এগিয়ে। এই ইলেকট্রনিকস্, জেট বিমানের যুগে সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমানের ফলে মানুষকে যতটা করে তুলেছে শিক্ষিত ঠিক ততটাই করেছে আত্মকেন্দ্রিক। প্রত্যেক মানুষ আজ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। নিজের কেরিয়ার গড়তে মানুষ বদ্ধপরিকর। ছুটে চলেছে উর্দ্ধশ্বাসে। কোন দিকে তাকাবার অবকাশ নেই। মুছে যাচ্ছে আবেগ, সরে যাচ্ছে অনুভূতি। ঠিক এই মুহূর্তে প্রশ্ন উঠতে পারে আজকের দিনে প্রেম কি বিলুপ্তের পথে? ঠিক বিলুপ্ত না হলেও প্রেম কিন্তু ক্রমবির্বতনের পথ ধরে এক নুতন সংজ্ঞা বহন করে। এক উচ্চ শিক্ষিতা ধনী স্ত্রীলোক তার এক প্রতিবেশীকে তার কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছে যে "আমার মেয়ের কি পয়সার অভাব যে সে প্রেম করবে?" মোটামুটি এই একটা উদা-হরণ থেকেই আমরা আধুনিক প্রেমের সংজ্ঞা পেতে পারি আজকের দিনে প্রত্যেক পিতামাতারা মুখে বলে থাকেন যে প্রেম পবিত্র অথচ তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রেম করলেই চরিত্রহীনতার ভয় থেকে যায়। অথবা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ও থেকে যায়। উক্ত শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মতে তার মেয়ে কখনই প্রেম করতে পারেনা কারন তাদের পয়সার অভাব নেই কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধনী যুবকের সঙ্গে তার মেয়ে কখনই প্রেম করলেও করতে পারে যেহেতু যুবকটি ধনী তখন লোকে কিছু বললেও শুনতে হবে কারন এখানে তার মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।

এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। তার আগে আলোচনা করা যাক প্রেম জিনিসটা কি? আমি কিন্তু ঈশ্বর প্রেম বা ব্যাপক অর্থে প্রেম কি তা বলছি না আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি নর-নারীর প্রেম নিয়ে।

প্রেম এমনই একটা জিনিস যেটা মনের গোপনতম স্থানে অবস্থিত। এটা আর কিছুই নয় একটা সুক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া। প্রেম একেবারেই নিজস্ব গুণ। স্ফটিকের মত নির্মল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে নিঃস্বার্থ প্রেমের কথা! প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ প্রেম কিছুই নেই। আর কোন কালেই ছিল। প্রেম যদি নিঃস্বার্থ হয় তবে অভিধানে 'বিরহ বেদনা বলে কোন কথাই থাকত না। প্রত্যেক মানুষই চায় অন্তত একজন মানুষের পূর্ণ বিশ্বাস। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেতে। দুজন মানুষ যখন তা পরস্পরের কাছ থেকে পূর্ণমাত্রায় পায় তখনই তাকে চিনি প্রেম বলে। তাহলে অবশ্যই প্রেম নিঃস্বার্থ নয়। আবার স্বীকার করতেই হয় প্রেমে পড়লে সহবাসের আকাঙ্খা থাকবেই আর সহবাস সম্ভব নয় বিয়ে ছাড়া।

সুতরাং বিয়ের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা কিন্তু তার মানে এই নয় বিয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্তই যথার্থ প্রেমের সম্পর্ক তার পরেই সেই সম্পর্ক খতম। সহবাস, কামনা তো থাকবেই আবার ফুরিয়েও যাবে তাই বলে সেই সঙ্গে প্রেম অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে না। কামনা সোপান মাত্র আসল কথা হচ্ছে ভালবাসা তীব্রতম শারীরিক অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে পুরুষ ও নারী অনেক বেশী গভীর ও শান্ত এক মানবিক অনুভূতির প্রাঙ্গনে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায় এসে তার নাম সুখে দুঃখে হাত রাখা ওরফে বন্ধুতা ওরফে প্রেম।

বিবাহং তো অনেক পরের কথা তার আগে চাই মন দেওয়া নেওয়া পরস্পরকে বুঝে দেখা, উপলব্ধি করা। অর্থাৎ মাঝে থাকে একটা পাঁচিল তার পাশে থাকে নারী অপর পাশে থাকে পুরুষ। প্রথমে শুধুমাত্র চোখ তুলে দেখা তারপর চোখের আহ্বান। চোখেরও ভাষা আছে সে মুখের মত বাচাল নয়। উচিত সময়ে যথাযথ কথা বলতে তার জুরি নেই। এর পর শুরু হয় পাঁচিল টপকানো, একে অপরের নিকট আসার চেষ্টা অর্থাৎ যোগাযোগ প্রক্রিয়া আর এই প্রক্রিয়ার অদ্বিতীয় উপায়টি হল প্রেম পত্র। তারপর মান অভিমান ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে প্রেম তার পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। সচ্ছ বা নির্মল প্রেম মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষত থাকে।

এবার আসি এই শতকের প্রেমে—আজকের যুবক যুবতী শিশু থেকেই তার পিতা মাতার কাছ থেকে আকার ইঙ্গিতে প্রেম সম্বন্ধীয় কিছু শিক্ষ্যা পেয়ে থাকে। একজন যুবতী জেনেছে যে তার আশেপাশে যে ছেলেরা তার সঙ্গে মেশার সুযোগ পাবার জন্য ঘুর ঘুর করছে তারা এক একটা শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সতীত্বহরণ করা ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভুলিয়া ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে শয্যা সঙ্গিনী করা আর উদ্দেশ্য সফল হবার পর সরে পড়া।

অবিবাহিত যুবতীর গর্ভসঞ্চার ও কিছু লোমহর্ষক ঘটনা কোন যুবতীকে যে কোন পুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে রূঢ় ও বিশ্বাস হীন করে তোলে। অপর ক্ষেত্রে ছেলেরা অভিভাবকদের কাছে এই ধরনের কিছু শিক্ষা পায় যে প্রেমের গল্প পড় না, মেয়েদের সঙ্গে মিশোনা ওরা তোমার উচ্চাশা বা লক্ষে পৌছিবার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। আর ওদের একমাত্র লক্ষ হচ্ছে ছলাকলা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনমতে নিয়ে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া। তাই খবরদার ওরকম ঘটনা যেন করো না তাহা হলেই তোমাকে মূল্যধন করে ব্যবসা করার পরিকল্পনাটা ডকে উঠে যাবে।

এইভাবে পিতামাতা বা অভিভাবকরাই ছেলে মেয়ের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করে দেয়। এই পারস্পরিক অবিশ্বাসের পঠভূমিকায় যখন সত্যিকার স্থায়ী সম্পর্কে ভিত্তি স্থাপিত হয় তাসের ঘরের মত সে সম্পর্ক চিরকাল ঠুনকো হয়ে থাকে। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রেমের সূত্রপাত অর্থাৎ যোগাযোগ মাধ্যম সেই প্রেম পত্রের শেষে পত্র লেখকের কোন নাম থাকে না। কোন ক্ষেত্রে "তোমার প্রিয়" কোন ক্ষেত্রে কিছুই নয় অদ্ভুদ ব্যাপার সুরুতেই কেমন যেন অবিশ্বাসের সুর, আমার এক বন্ধু আছে সে এক যুবতীর সঙ্গে প্রেম নামক বন্ধনে আবদ্ধ সম্প্রতি এক উৎসবে মেয়েটিকে যখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন অন্য একটি ছেলের সঙ্গে তাকে আবিস্কার করে। যথারীতি কথা বলতে

হাওয়াতে ঠকর। মেয়েটা চিনেইনা এমন কায়দায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বন্ধুটি তখন বিস্ময়ের শেষ চূড়ায়। তারপর রাগবশত মেয়েটিকে কিছু কথা বলেছে ব্যাস পরদিনই প্রেমের ইতি তুমি আমাকে অপমান করেছ তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। কিছুদিন পরে জানা গেল উক্ত মেয়েটি অন্য ছেলের সঙ্গে জুটিয়ে প্রেম করছে। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এক স্বার্থপর দৃষ্টান্ত। এইসব যেনে প্রথমেই তারা খুঁজে নেয় হাতের পাঁচের মত একটা প্রেম যে প্রেমের নায়ক হবে ভালোমানুষ গোছের যার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে সবসময়ে। তারপর চেষ্টা চালাতে থাকে সবকিছুতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর নায়ক খোঁজা। পেলেই কোন একটা কারণ দেখিয়ে ল্যাং মেরে অন্যটিকে আঁকড়ে ধরা। এই উজ্জ্বলতর থেকে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ লক্ষে পৌছিবার এক ভয়ংকর হাস্যকর প্রচেষ্টা।

প্রেমের নীতির ক্ষেত্রে আমার এক অভিজ্ঞ বন্ধুর উপদেশ মনেরাখার মত। তার মতে প্রেম করতে হবে একের অধিকের সাথে তাতে কিছু অসুবিধা থাকলেও সুবিধা প্রচুর। আর সবচেয়ে বড় কথা প্রেমিক বা প্রেমিকা হারাবার কষ্ট থাকে না।

দৈনন্দিন জীবনেও দেখা গেছে যে একজন প্রেমিক বা প্রেমিকা তার প্রিয়া বা প্রিয় কে ক্রমশ আস্তে আস্তে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে চলেছে। কিন্তু বিপরীত-ভাবে অন্য একজন যুবক বা যুবতীকে সম্মান দিচ্ছে। এগুলো প্রেমে ধাঁটা পরে যাওয়ার ফল বা একঘেয়েমি আসার ফল। আসলে ঐ প্রেম তো পার-মানেন্ট তাই সম্মান সেখানে অপ্রয়োজনীয়। আবার যদি এক পক্ষ থেকে প্রশ্ন আসে এরকমের হেতু কি? তাহলে অপর পক্ষ হাবেভাবে বোঝাতে চাইবে তুমি বুঝতে চাইছো না কেন তোমাকে বেশী সম্মান দেখালে বাড়িতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় থাকছে না। বহু যুবক যুবতী আছে যারা কলেজের কমনরুমে, থিয়েটারের গ্রীনরুমে অথবা গার্ডেনের গাছের নীচে সামান্য একটু হাসি, একটু গল্প, একটু মেলামেশার পর দাবি করে যে তারা প্রেম করেছে। অথচ তারা দুজন দুজনকে জানল না। বুঝল না শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কিছুই পেল না তবুও তারা বুক উঁচিয়ে বলে আমরা প্রেম করি। এদের এই দাবির মধ্যে সুক্ষ গর্ববোধ আছে। অথচ আধুনিক ছেলেমেয়েদের স্মার্টনেশ প্রকাশ পাই উক্ত প্রেমের মধ্যে দিয়ে। আবার যে ছেলে যতবেশি উক্ত প্রেম সম্পন্ন করেছে তার স্মার্টনেশ। ব্যক্তিত্ব তত বেশি। এক্ষেত্রে কেউ হ্যাটট্রিক কেউ ডজন কেউ বা সিকি সেঞ্চুরী' আমি একটা মেয়েকে জানি মেয়েটিকে তার প্রেমিকের বন্ধুরা একদিন কি এক অসভ্য কথা বলে টোন কাটে। ব্যাস মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে এই মর্মে তার প্রেমিককে এক গুরু-গম্ভীর পত্র পাঠায়— "তোমরে বন্ধুরা আমার ইনসাল্ট করেছে। তুমি যদি বারণ না কর তবে আমি নিজেই স্টেপ নেবো তাছাড়া ওরকম করলে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও দুঃসহ হয়ে উঠবে" পত্র পেয়ে ছেলেটির ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। মেয়েটি ছেলেটিকে জানতে চেষ্টা করল না বুঝতে চাইল না বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কিরকম। কোনদিন পূর্ণ আস্থায় বিশ্বাস করতে পারল না আবার ভাবটা এমন যে-দয়াবশত আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করছি এরকম হলে আমার পক্ষে প্রেম করা সম্ভব হবে না। অথচ মজা এখানেই—ছেলেটি গর্ব করে মেয়েটির অগাধ ভালোবাসা নিয়ে। এ এক অদ্ভুদ ট্রাজিডি। তাই আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রেক শব্দটি নেহাতই অর্থ-হীন এক বাজে কথায় পর্যাবসিত হতে চলেছে। এইসব আধুনিক প্রেমের উদাহরণ দেখে তাই অনেকেই মুচকি হেসে ওঠে তারপর বাস্তবতায় ভরা নগরের কোন এক ক্ষুদ্র কোনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখে পাশ কাটাবার ভঙ্গিতে বলে অত সময় কোথায়? এক এক সময়ে মনে হয় চিৎকার করে বলি আদম ও ঈভ দেখে যায় তোমাদের সম্পর্ক আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে।

—+—

বিঃ দ্রঃ—উদাহরণের সত্যতার জন্য কেউ আঘাত পেলে দুঃখিত।

অধিকার

নিমাই দাস
বি. কম. প্রথম বর্ষ

"দাদা আমায় পূজোতে জামা কিনে দিবি না? দেখ না, আমার বন্ধু সোমা কেমন সুন্দর জামা পরেছে। আমায় পূজোয় জামা কিনে দিতে হবে," বলে পা-জড়িয়ে কাঁদতে থাকে সুতপা। সে তো বাচ্ছা মেয়ে অতো বোঝে না কিছু তাই সুতপা কাঁদছে। বাবলু তাকিয়ে দেখল তার বোনের দিকে এবং ছোটো বোনকে একটা জামা কিনে দিতে না পারার জন্য নিজেকেই নিজের ঘৃণা করতে ইচ্ছা করল। কি করবে বোনের দিকে তাকিয়ে দু-ফোটা চোখের জল ফেলে প্রেসক্রিপশানটা হাতে নিয়ে বার হয়ে গেল।

একটা টাকাও নেই তার হাতে; কি দিয়ে ঔষধ কিনবে? কিন্তু ডাক্তার যে বলে দিয়েছে "এক ঘন্টার মধ্যে ঔষধটা না খাওয়ালে তোমার মাকে বাঁচানো যাবে না"। তাই তার শেষ সম্বল হাতঘড়ি সেটাই নিয়ে চল্ল মায়ের ঔষধ আনার জন্য। কিন্তু ঘড়ি বিক্রি করেও মায়ের ঔষধের টাকা হলো না। আর সময় ও বেশি নেই তাই সে ছুটে গেল যেখানে সে তাঁত বুনত। সেই মহাজন বাড়ী। কিন্তু সেখানেও টাকা পেল না। অসহায়ভাবে ছুটে ডাকঘরের মাথায় মন্ত্রীর ঘরে গিয়ে বাবলু চিৎকার করে বলতে লাগল মন্ত্রীর সামনে "বেঁচে থাকা তো মানুষের মৌলিক অধিকার, তবে আমার মা কেন এককোঁটা ঔষধের জন্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? কথা বলছেন না কেন?" ও বুঝেছি বেঁচে থাকার অধিকার শুধু ধনী লোকেদেরই।

কেউ শুনলো না তার কথা, পুলিস হাত ধরে তাকে বাইরে বার করে দিল। সেখান থেকে সে ছুটে চলল টাকার সন্ধানে। তার চোখে পড়ে গেল রাস্তার পাশেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। ঢুকে পড়ল সে ব্যাঙ্কের মধ্যে। চিৎকার করার আগেই ক্যাসিয়ারের মুখ বন্ধ করে দিল তার হাতের পিস্তল। সেখান থেকে সে ছুটে গেল ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ নিয়ে বাড়ী ফিরল বাবলু। সে উন্মাদের মতো ঔষধ ঢেলে দিতে লাগল মায়ের মুখে। কিন্তু কে খাবে ঔষধ ততক্ষণে তো সময় পার হয়ে গিয়েছে।

ছোটো বোন চিৎকার করে বাবলুর গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল "দাদা আমি জামা চাই না, তুই মাকে ফিরিয়ে আন।" বাবলুও বোনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোলে তুলে নেয়। কিন্তু সান্ত্বনা আর দেওয়া হল না। চুলের মুটি ধরে পুলিশ তাদের গাড়ীতে তোলে বাবলুকে। ব্যাঙ্ক ডাকাতির দায় তার হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

—+—

শক্তি লাঞ্ছিত

স্বপন কুমার সাহা
বি-কম, প্রথম বর্ষ

দাদাভাই আমি আর পারছি না, আমার বয়স হয়েছে, যত দিন যাচ্ছে আমার শরীরের বল কমে আসছে, আবার তার উপর গতকালের অনুষ্ঠানে বেশ খাটাখাটুনি হওয়ায় আমার শরীর আরো দুর্বল দাদাভাই। আজকের ছাত্র যুবো অনুষ্ঠান কিভাবে সুন্দর ও সার্থক করে তুলবো তাই ভাবছি। বড়ুর আয়োজন, বেশ কয়েকজন অতিথি আসছেন, তাছাড়া আমার কলেজে আজকে শান্তিপুরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট ছোট ভাই বোনেরা আসছে, কলেজ আজ আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠবে। আনন্দে মুখরিত আজ কিন্তু আমি। দাদাভাই আজ কিন্তু তোমার প্রচুর কাজ। আগত অতিথিগণের একটুকু যেন আতিথ্যের অভাব না ঘটে। আজকের অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতেই হবে। এতে আমার সম্মান জড়িত।

ঘুম ভাঙতেই দেখি একি আমি কার সঙ্গে কথা বলছি? আমার কাছেতো কেউ নেই। তবে কি স্বপ্ন, না ভালোবাসার অভিপ্রায়। যাইহোক শক্তির আরাধনার স্থলে পৌঁছাতে লক্ষ করলাম ছাত্র সংসদ দ্বারা আয়োজিত ছাত্রযুব উৎসবের বিরাট আয়োজন।

স্তম্ভিত হলাম সংসদের দাদাদের তরিঘরি দেখে, এতো সকালে তাদের এতো আয়োজন। শক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়া কি সত্যিই যথার্থ। শক্তির কথামত আমি কাজ শুরু করলাম। আয়োজন চলছে। মাইকে গান হচ্ছে –"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে"। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রংবেরঙের পোষাক পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল আগমনের সাথে সাথে অনুষ্ঠানের শুভো সূচনা হয়।

অনুষ্ঠান চলতে থাকে মানুষের ভিড়ও বাড়তে থাকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. কিরণ চৌধুরীর বক্তব্য শোনার আশায় আগত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট সোরগোল। যথা সময়ে আগত অতিথির ভাষণ শুরু হল। ভাষণ চলছে। এমত অবস্থায় কিছু ছাত্রের চক্রান্ত শুরু হল। কি করে ছাত্র সংসদ দ্বারা আয়োজিত ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করা যায়। চক্রান্ত সার্থক হলো। তবে ব্যাথার বাঁশি বেজে উঠলো ছাত্র সংসদের দাদাদের বক্ষে। ব্যাথা পেল আমার মত আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রী। আগত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা মণ্ডলী।

জানতে ইচ্ছে হলো কারা এই চক্রান্তকারী? মনে পড়ে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা। মনে পড়ে মীরজাফরের কথা। সত্যি মীরজাফরের দুরভিসন্ধিতে যেমন বাংলার মাটিতে হারাতে হয়েছিল সিরাজকে। এদের দুরভিসন্ধি যদি না হতো তাহলে হয়তো ইংরেজের হাতে দাসত্ব জীবন ভারতবাসীকে কাটাতে হতো না অর্থাৎ 'অস্ত্র তুমি যার হাতে তুলে দেবে দেখেনিও বিশ্বাসঘাতক সেই।' অনুরূপ দুটি-কয়েক ছাত্রের চক্রান্ত না ঘটলে হয়ত শক্তির সইতে হতো না অপমান। ফিরে পেতো অনেক সম্মান।

ইতিহাসের কথা ভাবতে ভাবতে আমার কৌতূহল আমার আরো বেড়ে [illegible] চক্রান্তকারী। কি কারণ বশতঃ তাদের এই চক্রান্তের কারণ। চক্রান্তকারীদের [illegible] সহজেই বুঝতে পারলাম চক্রান্তকারীরা কলেজের ছাত্র এবং তারা এক ছাত্র [illegible] আবদ্ধ।

বন্ধু, যারা ১৫ই অক্টোবর শুক্তির আশাকে ধূলিস্যাৎ করেছে। যারা শুক্তির [illegible] দের সম্মান-পত্র আগত অতিথিদের সম্মুখে পুড়িয়ে শুক্তির সারা অঙ্গে কালিমা লেপন [illegible] এই ক্রিয়া কলাপে শুক্তি আজও ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর বলছে সামান্য [illegible] একটু সম্মান, একটু ভালোবাসা, যারা আমার সম্মানকে কলঙ্কিত করেছে, যারা [illegible] আঘাত হেনেছে তাদের বিচার আমি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অর্পণ করলাম। [illegible] আজ ও আপতাদের বিচারের আশায়;

"আমার খেলার পুতুল ভেঙ্গে গেছে প্রবল ঝড়েতে"

অরবিন্দ মৈত্র (প্রাক্তন ছাত্র)

জবাব দেওয়া বোধ হয় একেই বলে! অন্যায়, অবিচার, উপেক্ষা, [illegible] দেওয়ার জন্যই আমাদের বেছে নিতে হয় রাজনৈতিক মঞ্চ। এই মঞ্চে কেউ [illegible] সফল হয়, কেউ হতে পারে না। মনের ক্ষোভ মনেই থেকে যায়। [illegible] ১৯৮৪ সালে কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে আমার প্রিয় মহাবিদ্যালয় থেকে চলেছি, ঠিক [illegible] নায়কেরা হাসেন মুখ টিপে টিপে। তখন হয়ত তারা ভাবেন তাদের দিন আবার [illegible] এলো। কিন্তু আমাদের উত্তরসূরীরা পর পর নির্বাচনে উপযুক্ত জবাব দেন। [illegible] শেষ আছে, কুচক্রের নায়করা পরবর্তী চক্রান্তের জাল ছড়ানর জন্য চেষ্টা করেই [illegible] অনেকটাই ঘোলা হয়েছিল, তবে এ জলে না নামায় শ্রেয়। কারণ আমরা [illegible] আমাদের সঞ্চয় আদিগন্ত বিস্তৃত ছাত্র সংগঠন, অন্যদিকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ও [illegible] সুতরাং নরকের কীটের মত কিছু দংশন, যা ঝাঁঝরা করে দিতে চায় ঘারতীয় গৌরব [illegible] সম্প্রতি কেউ কেউ আমাদের গড়ে ওঠ ভাব মূর্তির অবয়বে কালি ছেটানোর চেষ্টা শুরু [illegible] আগেও তো এ ঘটনা ঘটেছে এবং শান্তিপুর কলেজের ভাই বোনেরা তা পরম যত্নে [illegible] সরিয়ে কলেজে নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। ওদের দেওয়া সমস্ত বিষ পান করে [illegible] সকল ছাত্রছাত্রী হয়ে উঠেছেন এক-একজন নীলকণ্ঠ সুতরাং...... কিন্তু এ লেখা নিয়ে [illegible] কলম নিয়ে বসেনি, কারণ আমার তো লেখা শুক্তিকে নিয়ে, তবে ? আর দেরি [illegible] লেখনীকে ওর কাছে ঠেলে দিই দেখা যাক্ ও কি লেখে কারণ—

'শাখাজালে শুধু যেন বাঁধা যায়
ফুলে বাঁধা যায় মন
উপহার, সে তো শুধু দেওয়া যায়
তাই দেওয়া আয়োজন'

১৯৮৫-র বিদায় বছরের সন্ধ্যা নেমে এসেছে, আজ আর আকাশে কাল বৈশাখীর তাণ্ডব নেই। আজ আকাশে আবার তারার ছড়াছড়ি, রাত ১১টা বাজতে একটু বাকি, উপরে নিস্তব্ধ নিথর আকাশ। ঝিকি ঝিকি তারার আলোয় নীল আকাশ ঝলমল করছে, বাইরে থেকে এসে কখন বিছানায় শুয়ে পড়েছি তার খেয়াল নেই, হঠাৎ কড়া নাড়ানাড়ি। রাতের বাতি আলোটা জ্বলেনি। ঘুম চোখে হঠাৎ খুলতেই দেখি ১৯৮৬ হাজির। মুচকি হেসে আমারই হাতে একটা কার্ড দিল। বেশ 'শুক্তি' পাঠিয়েছে, হঠাৎ এ চমকে গেল। কার্ড খুলতেই দেখি—

'He comes life the morning star full of life, splender and love'
Happy and prasperous.

New year Sukti 1986

বেলা গেল কেটে, চোখ মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে চললাম শুক্তির বাড়ি অভিনন্দন আর আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালবাসা ও দীর্ঘায়ু কামনা করতে কারণ—

'শুক্তি'র মধ্যে খুঁজে পাই মায়ের স্নেহ, বোনের অকৃত্রিম আন্তরিকতা বান্ধবীর উদার মাধুর্য, তাই ছুটে চললাম। দেখা হতে মিষ্টি হাসি হেসে আমার দিকে কয়েকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, কি লিখছ? রাজনৈতিক কোন লেখা নয়তো? আচ্ছা দাদা-ভাই তুমি কি পারনা একটা চলতি সামাজিক লেখা লিখতে? যাতে লেখা থাকবে আশা, হতাশা, অনুতাপ, যেমন বা তোমার জীবনে দেখা আসা দিনের ঘটনা? সত্যি বলতে কি তাই এ লেখা এ আমার কল্পনা। এর মধ্যে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই, নেহাৎ সাহিত্যিক হবার অবাস্তব মানসিকতা। বোনের খোঁচাতেই এ লেখা। দেখা যাক আমার সাহিত্যিক হবার স্বপ্নটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কি লিখব? এ ভাবনার কোন কিনারা পাবনা। একটা মহাজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছি। এ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব। অনেক কিছুই আমার কল্পনার অর্থ খুঁজে পাব না। অতীত মানুষের পুরানো স্মৃতি যার আস্তরণ পড়ে গেছে। আমি অতীত ফিরে পেতে চাই না। 'শুক্তি' নারী বলিষ্ঠ লেখা বলে আমি চেষ্টা করে দেখছি। হঠাৎ 'শুক্তি' বলল, আছে মানে আছে। খোঁজার মত খোঁজ, ঠিক খুঁজে পেয়ে যাবে। আর তা না হলে তোমার সাহিত্যিক হবার স্বপ্নের ফানুসটা ছিঁড়ে যাবে।

আমি 'শুক্তি'কে বললাম দেখো, আমার জীবন নাটকের যে পরিচ্ছেদ চলে গেছে তা আবার লেখনীর মাধ্যমে জীবন্ত করতে চাইনা। আমার স্বপ্নের দ্বার জানালার ঐ মিট মিট করা আলোটা আজ অন্ধকারের সমাপ্তি ঘোষণা করছে। তুমি সেই কালো পর্দায় ঢাকা আমার অতীতকে সমাধি থেকে তুলে আনতে অনুরোধ করো না। কারণ নারী বলতে আমি যা বুঝি তা হলো—

তাই তোমার কাছে অনুরোধ যে চলে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে এনে লাভ কি ?

কিন্তু জীবনে তো পালা বদল আছে দাদাভাই ? হ্যাঁ আছে, জীবনের রঙ বদলের পালা আছে ঐ যে আকাশের রঙটাও লাল, আগুনের লাল তরঙ্গে জ্বলছে ঐ আকাশটা, পৃথিবীর সমস্ত আগুন ঐখানে জ্বলছে। তা জ্বলুক, দাউ দাউ করে জ্বলুক। কালবৈশাখীর ঝড় উঠুক, কারণ ঝড়ের মধ্যে প্রাণ আছে, প্রাণের মধ্যে সাড়া আছে। ঝড়ের উন্মত্ত নাচে পৃথিবীর হৃদযন্ত্র তবুও চলছে।

শুক্তি বলল আচ্ছা দাদাভাই তোমার তো আকাঙ্খা আছে ? ইচ্ছা আছে ? হ্যাঁ আমি জানি যে আমার আকাঙ্খা আছে ? মানুষের আকাঙ্খা বড় বিচিত্র। আকাশের ঐ বিচিত্র রঙের মত বিচিত্র আকাঙ্খা মানুষকে জোগানদারী করতে করতে বেঁচে থাকার সন্ধান করতে হয়, তারপর সব ফুরিয়ে যায় কেউ সমাধিতে আশ্রয় নেই, কারণ আকাঙ্খা মিশ্রিত কাঠামোটা চিতায় দাউ দাউ করে জ্বলে। কিন্তু আকাঙ্খা কি মরে ? সে যে চিরস্থায়ী ?

কিন্তু তুমি যে বলছে সেই মেয়েটার কথা ঐ যে 'সেই' মেয়েটা, ওর সম্বন্ধে কিছু বল দাদাভাই

'শুক্তি' এ যে আমার অনাদি অনন্ত কালের কথা, পাঁচ বছর আগে রাতের পর রাত জেগে কল্পনার দাঁচড়ে তাকে প্রানান্ত করে তুলেছিলাম, সে যে মারা গেছে এক কাল বৈশাখীর ঝড়ে, ও 'শুক্তি' ওর চেহারা ছিল ঔদার্য মাখানো চোখের চাউনি অন্তর স্পর্শ করতো। ঐ মুগ্ধ আকৃতির আমি ওকে ভালবাসতাম। কারণ ওর শ্রীর সঙ্গে শ্রীলতা ছিল।

হঠাৎ শুক্তি' প্রশ্ন করল তারপর ?

আমার মনে ওর প্রতি একটা দীপ্তি রোশনাই জ্বলতো, মনে মনে ভয় হতো একটা আগুন জাগাতো। যে দিন আমি ওর সাথে প্রথম কথা বলি সেদিন আমার মনে রঙ লেগেছিল, সে রঙে আমার মন যেন পূর্ণিমার জোৎস্নার মত ঝলমল করে উঠেছিল। ওর আগ্নেয়গিরির মত যৌবনটা যে আগুনে জ্বল ছিল, কিন্তু আমি জানি অসুন্দরের হাতে সুন্দরের সমাধি, এই পৃথিবীতে অনেক চরিত্র হীন অসুন্দরের প্রেতমূর্তি ধরে সুন্দরকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু আমি ওকে সুন্দরের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে ভালবাসার মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম, তাই—

আমার ওকে নিয়ে অনেক বাসনাই ছিল। যা আজ অতীত, যা আজ স্বপ্ন। অতীতে ঝাঁদা যন্ত্রনাভরা বাসনার বৈভবীমালা গলায় পরে আমাকে ভুলে থাকতে হচ্ছে আজও। তাই তোমার কাছে অনুরোধ আমার স্মৃতি আমাকে স্মরণ করে দিওনা। আমাকে অতীত ভুলতে দাও। আর যা কিছু স্বপ্ন তা জোৎস্নালোকে শুকিয়ে গেছে।

চিন্তা সূত্র আমার ছিঁড়ে গেল, হঠাৎ খেয়াল হলো শালীনতা শোভনতার পর্দাটা উড়ে গিয়েছে এতক্ষণ আমি দেখিনি আমার আক্ষিপ্রায় জলের রেখা, তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম। শুক্তি বিদায় আর শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম, দূরে মাইকে আওয়াজ কানে ভেসে এল শিল্পী গাইছে "কবে যে কোথায়, কি যে হ'ল ভুল, জীবন জুয়ায় হেরে গেলাম"।

মনে মনে হাঁসিও পেল, যথা সময়ে শিল্পী 'আমার কাছে' যথার্থই গানটি বেছে নিয়ে গাইছে আবার মনে মনে ১৯৮৬-র প্রতি রাগ ক্ষোভ জন্মে নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসেছিল।

কিন্তু এ আমার কল্পনা নয়, এ আমার বাস্তব, তাই মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বাস্তবকে স্বীকার করেই বাড়ীর পথে চললাম।

এন, সি, সি, বিভাগ থেকে বলছি—

"শীত আসে পাতা ঝরে
ফাগুনে আবার আগুন ধরে ।"

তাই একদিন সময় হয়েছিল এসেছিলাম আবার একদিন সময় হবে চলে যাবো। তারপর আবার বছর কুড়ি পরে যদি দেখা হয় তার সাথে আমার। তখন হয়ত দেখব তার কোলে একটি ফুটফুটে শিশু হাত পা ছড়িয়ে তার সমস্ত ম্যাকাপ নষ্ট করে দিচ্ছে। আমি হয়ত তখন তাকে প্রশ্ন করব কেমন আছো, কেমন চলছে সংসার? হয়তো বা দেখব আমার কোন N. C. C. ভাই দিল্লি প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাড়িয়ে কমাণ্ড দিচ্ছে। আমি তখন সবাইকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাব ঐ দেখো ও শান্তিপুর কলেজে ছেলে।

কাজের কথা— গত বছর দুটো নজির দেখিতে পাওয়ার জন্য লেখা হয়নি। প্রথমত, ১৯৮৩ সালের জুন মাসে রাজস্থানের মাউণ্ট আবুতে Advance Leadership Camp এ আমাদের কলেজের U. O. শম্ভু মণ্ডল কৃতিত্বের সঙ্গে এই ক্যাম্প শেষ করে, দ্বিতীয়ত. ১৯৮৩ র Oct. মাসে লালবাগে 9 Bengal আয়োজিত যে Combinded Annual Training Camp হয় সেখানে ভলি খেলায় শান্তিপুর কলেজ প্রথম স্থান লাভ করে এবং আমাদের Codet সুশান্ত পাল শ্রেষ্ঠ খেলোয়ারের পুরস্কার পায়।

১৯৮৪ সালের নজির—দিনটাছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারী এইদিন কল্যাণী গ্রুপের ড্রাইরেক্টর কমাণ্ডার আসেন আমাদের N C C ঘর এবং প্যারেড পরিদর্শন করতে। এইদিন কলেজ মাঠটাকে আমরা সুন্দর করেই সাজাই এবং সেরিমোনিয়াল ড্রিলের আয়োজন করি এই ড্রিলে দুটো প্লাটুন ছিল, প্রথমটির ভার প্রাপ্ত ছিল S U. O সঞ্জয় দাস, দ্বিতীয়টির ভারপ্রাপ্ত ছিল U. O সুব্রত বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ ড্রিলের কমাণ্ডার ছিল U. O সুবীর চক্রবর্ত্তী এছাড়া আরও ৬০ জন ক্যাডেট অংশ নেয়। Director Commender আমাদের ড্রিলের খুব প্রশংসা করেন, কিন্তু N C.C ঘরটি দেখে খুব অসন্তুষ্ট হন।

২২।৪।৮৫ তারিখে কৃষ্ণনগরে 14th Bengal office মাঠে কল্যাণী গ্রুপ কমপিটিশনে যাবার জন্য Best Codet Compettior হয়, তাতে শান্তিপুর কলেজের U. O সুবীর চক্রবর্ত্তী প্রথম স্থান লাভ করে। ২৪।৪ ৮৫ তারিখে কৃষ্ণনগরে C এবং B Certificate পরীক্ষা হয়। আমাদের কলেজের ৪৩ Codet B certificate এবং U.O সুব্রত বিশ্বাস সহ আরো পাঁচজন সার্জেণ্ট C certificate পরীক্ষা দেয়।

৭ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্যন্ত লালবাগে 9 Bengal আয়োজিত Combinded Annual Training Camp আমাদের কলেজের ২৫জন অংশ নেয়। আমাদের কলেজ ড্রিলে ২য় স্থান, ফায়ারিং ফাইটিং এ ১ম স্থান, ক্রস কান্ট্রিতে গ্রুপে ২য় স্থান লাভ করে, এবং ফক্ ড্যান্সে ১ম ফক্ সঙে ২য় স্থান লাভ করে। ফক্ ড্যান্সে অংশ নেয় CPL পার্থ চট্টোপাধ্যায় Codet প্রশান্ত কুমার দত্ত ও ফক্ সঙে অংশ নেয় SGT ইন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, Codet অশোক ভট্টাচার্য, প্রশান্ত কুমার দত্ত, দেবপ্রসাদ মুখার্জী। এই ক্যাম্পে CPL পার্থ চট্টোপাধ্যায় জিমনাষ্টিক দেখিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

২১৯।৮৫ তারিখ থেকে ১৩৯।৮৫ তারিখ পর্যন্ত কল্যাণীতে যে Annual Traing Camp হয় তাতে আমাদের কলেজের দশজন Codet ও U.O শম্ভু মণ্ডল অংশ নেয়। এখান থেকে আমাদের ১জন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিল্লীতে প্যারেডের জন্য পি আর ডি — ১ ক্যাম্পে যাবার যোগ্যতা অর্জন করে।

অক্টোবর মাসে সিকিমে Trekking Expedition Course. হয়, সেখানে শান্তিপুর কলেজের তিনজন অংশ নেয় U.O সুব্রত বিশ্বাস U.O শম্ভু মণ্ডল, CPL পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়া আমরা ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট দিন গুলি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করি। এই অনুষ্ঠানে আমাদের কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের সেলুট গ্রহণ করেন।

নানা রকম ঝড়ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছি। গতবারের লেখাতেও জানিয়েছি কিন্তু কোন ফল হয়নি এবারও জানাচ্ছি সববিভাগের ঘরগুলো যেমন বড় আমাদের N. C. C. র একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ করেন তাহলে খুবই আনন্দিত হব।

আমারও শীতকাল এসেছে, এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে এই কলেজ থেকে তথা এই কলেজের N.C.C. বিভাগ থেকে। এই বিদায় লগ্নে একটি কথাই বলে যাই " তোমরা কোনদিন পিছপা হয়ো না তোমরা গর্জে উঠে সবাইকে দেখিয়ে দাও শান্তিপুর কলেজের N. C. C কোন অংশে কম নয়, চিৎকার করে বলো আমরা পিছোতে জানিনা আমরা জানি শুধু এগিয়ে যেতে "।

অভিনন্দন সহ প্রতিবেদক

আণ্ডার অফিসার সুধীর চক্রবর্ত্তী

শান্তিপুর কলেজ এন. সি. সি, ১৪/৮নং কোম্পানী।

চিত্রশিল্পী থেকে বিজ্ঞানী—

অজয় কুমার পাল
বি, এস, সি, ১ম বর্ষ

আচ্ছা—

দু'টো প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক্। বলো তো "টরে টক্কা, টরে টক্কা, টক্কা টক্কা টরে টরে" এটা কি ভাষা না অন্য কিছু? কি ধাঁধা লাগছে? ঠিক আছে বলছি, তবে একটু পরে। আরেকটি প্রশ্ন—টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিস্কর্তা কে? ভাবতে থাকেন—ততক্ষণে আমি তার জীবনী ও কর্মকুশলতা নিয়ে কিছু আলোক সম্পাত করি।

২৭শে এপ্রিল, ১৭৯১ সাল। চার্লস টাউন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা শহর। একটি ছোট্ট শিশু জন্ম গ্রহণ করল যেন তার এ আগমনবার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য। আর সত্যিই নিজেকে সারা বিশ্বে সে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং আজও তার স্মৃতি আমরা বয়ে চলেছি। এই শিশুই সেই মহান ব্যক্তি যিনি পরবর্তীকালে ঐ টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিস্কার করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন- "স্যামুয়েল ফিন্‌লে ব্রীজ মোর্স" যাকে আমরা "স্যামুয়েল মোর্স" বলেই চিনি। আর শুরুতেই যে শব্দগুলি বলেছি সেটা হচ্ছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের বার্তা বিনিময়ের ভাষা।

তা, শিশুকাল থেকেই মোর্সের ছবি আঁকার ভীষন তাড়না ছিল যা তার বাবা রেভারেণ্ড জেডিডিয়া মোর্স মোটেই পছন্দ করতেন না। আর তাই ছেলেকে ছবি আঁকতে নিরুৎসাহী করতে 'ইয়েল'—এ পাঠালেন পড়াশুনার জন্য। কিন্তু হায়! ঝোক বড় সাংঘাতিক! তাই সেখানেও তিনি বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে উৎসাহ পেতে লাগলেন। অবশেষে 'ইয়েল' থেকে স্নাতক হয়ে বাড়ী এলে পর তার বাবা তাকে চিত্রাঙ্কন শেখার অনুমতি দেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ওয়াশিংটন অ্যালষ্টনের কাছে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা সম্পন্ন করে লণ্ডনে গেলেন জীবিকার্জনের জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন নিজভূমিতে। এর মধ্যে তিনি বিয়েও করে ফেলেছেন। স্বভাবতঃই সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ায় তাকে পনের ডলার পর্যন্ত পারিশ্রমিকেও ছবি আঁকার অর্ডার নিতে হয়েছে। একটি দুটি করে বছর গড়াতে থাকে আর তাঁর সংসারেও লোক বাড়তে থাকে। দেখতে দেখতে মোর্স তিনটি সন্তানের জনকে পরিনত হলেন। কিন্তু যথেষ্ট রোজগারের অভাবে পর পর দুটি সন্তান হারালেন। এতেও নিস্তার পেলেন না তিনি। অবশেষে তার প্রিয়তমা স্ত্রী ও যক্ষা রোগের নিষ্ঠুর আহ্বানে সাড়াদিলেন। নিদারুন শোকের মূর্ছনায় চিত্রাঙ্কনেও স্বস্তি পেলেন না। ভিটে-মাটি ছেড়ে ভাগ্যান্বেষনে মোর্স পাড়ী জমালেন ইউরোপের দেশে।

বস্তুতঃ চিত্রশিল্পী হলেও বাল্যকাল থেকেই তার বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ করে বিদ্যুতের প্রতি একটা বিশেষ কৌতুহল ছিল। তাই শিল্পচর্চার মাঝে মাঝে একটু আধটু বিজ্ঞান চর্চা ও করতেন। সেই সময় ফরাসী সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতি 'বাসীমাকোর' তাকে ভীষনভাবে আকৃষ্ট করে এবং এই আদান প্রদানের

ব্যাপারে বিদ্যুৎকে কাজে লাগাবার সংকল্প করেন। এই সুপ্ত অথচ দৃঢ় সংকল্পই তাকে আবার দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করে। তিনি তড়িৎ চুম্বক নিয়ে গবেষনা করতে করতে ভুলে যান চিত্রাঙ্কনের কথা। দিনরাত শুধু একই সাধনা কিভাবে বিদ্যুৎকে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে লাগানো যায়।

নিউইয়র্ক শহরে একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে মোর্স সেখানে চিত্রশিল্প অধ্যাপনার কাজ পান। মাইনে যা পান তা দিয়ে কিনে আনেন রকমারী যন্ত্রপাতি। তাঁর এই গবেষনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘর নির্দিষ্ট হয়ে যায়। দিনরাত শুধু গবেষনা করতেন আর বন্ধু বান্ধবদের ডেকে তার কলাকৌশল দেখাতেন। অনেকে বিশ্বাস করে তাকে উৎসাহ দিত আবার কেহ কেহ তাকে পাগল বলে রহস্য করত। তিনি কিন্তু পরিণতি না দেখে হাল ছাড়েন নি বরং যারা তাঁকে নিয়ে যত হাঁসি ঠাট্টা করত তিনি তত উৎসাহে কাজে মনোনিবেশ করতেন।

উদ্ভিদ যেমন উপযুক্ত মাটি, আলো, জল পেলে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে সত্যিকারের প্রতিভাও তেমনি সময়মত আপনার বিজয় পতাকা সর্বসমক্ষে মেলে ধরে। স্যামুয়েল মোর্সকেও তাই আর আটকিয়ে রাখা গেল না। বেরিয়ে এলেন বিশ্ব দরবারে। জাহির করলেন নিজেকে। আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত "টেলিগ্রাফ যন্ত্র" – ১৮৩৫ সালে। যার দুটি অংশ গ্রাহক ও প্রেরক। প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপে সংকেত ধ্বনি করলে তা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং যান্ত্রিক লেখনীর মাধ্যমে কাগজের ফিতার উপর ডট এবং ড্যাশ (—) চিহ্ন এঁকে যায়। এই ডট এবং ড্যাশ চিহ্নই হোলো টেলিগ্রাফের সাংকেতিক চিহ্ন। তাই একে বলা হয় "মোর্স-কোড" অর্থাৎ মোর্সের সংকেত এই চিহ্নগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজালে যে অর্থ হয় তা অক্ষরে লিখে ভাষায় রূপান্তরিত করলেই বার্তা প্রেরণ সম্পূর্ণ হয়।

১৮৪৩ সালের ৩রা মার্চ। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার টেলিগ্রাফ যন্ত্র কিনে নেন এবং ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন পাতার জন্য মোর্সকে ৩০,০০০ ডলার অনুদান মঞ্জুর করেন। মোর্সের আর্থিক কষ্ট দূর হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অভিনন্দনের পাঁপড়ি তার কোলে ঝড়িয়ে পড়তে থাকে।

২৪শে মে, ১৮৪৪ প্রত্যেকের জীবনেই যেমন কোন না কোন কিছু একটা স্মরণীয় হয়ে থাকে তেমনি ঐ তারিখটাও মোর্সের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। কারণ ঐ দিনই তিনি সার্থকভাবে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করেন। স্মরণীয় সেই সংবাদটি ছিল— "ভগবান কি বানিয়েছেন।"

আজ আর মোর্স আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার অক্ষয় কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। বলতে ইচ্ছে করে এরকম আরও— আরও মোর্স জন্মগ্রহণ করুক। ১৮৭২ সালে ৮১ বৎসর বয়সে এই শিল্পীরূপী বিজ্ঞানীর জীবনদীপ নিভে যায়।

এসো—এই মহান বিজ্ঞানীকে ও তার কর্মসাধনাকে স্মরণ করতে আমরা একবার তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করি - "স্যামুয়েল ফিনলে ব্রীজ মোর্স"

আজ কোথায় দাড়িয়ে

শ্রীশংকর মিত্র,
B-Com, 1st year

১৫ই আগষ্ট কেবল মাত্র ভারতবর্ষ বা এশিয়া মহাদেশই নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশরাজ যে সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা করে ছিল তার নিশ্চিত ও চূড়ান্ত পরাজয় এবং পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল।

বীরের রক্ত-স্রোত ও মাতার অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে প্রচুর ত্যাগ ও তিতিক্ষায় অর্জিত হয়েছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা। আমরা এই দিনটিতে সমবেত হই, সেই সব সাহসী ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে, যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রামে কষ্টভোগ করেছেন এবং জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলাম কারণ সকল জাতির, ধর্মের ভাষার সংস্কৃতির জনগণ একতাবদ্ধ হয়েছিল বলে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। বাপুজী বলেছিলেন "স্বাধীনতা সকল জাতির জন্মগত মৌলিক অধিকার।"

স্বাধীনতা দিবস আজ শুধু কি এক অতীত স্বপ্ন না জাগ্রত স্মৃতি? ৩৮ বৎসর পরে দেশের সর্বত্র পুনরায় যে দুর্যোগের ঘনঘটা তা কি স্বপ্ন মায়া না মতিভ্রম? যে দিন দেশ প্রথম স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেদিন আসা করা গিয়েছিল যে, দেশ বিভাগের সহিত বিচ্ছিন্নতাবাদ নামক প্রবল দৈত্যটি নিহত ও অনন্ত শয্যায় শায়িত। সে দিন কাশ্মীরের হানাদার পরাভূত হায়দরাবাদের নবাবের উদ্ধত শীর অবনত ত্রিপুরা ও তেলেঙ্গানার বিপ্লবও বুলেটের ঘায়ে শায়িত।

আমরা দুঃখিত কারণ আমরা আমাদের ইতিহাস শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমরা বেদনাগ্রস্ত কারণ কিছু দেশী ও বিদেশী অশুভ শক্তি বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা আমাদের দেশের ঐক্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করেছে। ধর্ম ভাষা, জাতি ও অঞ্চলের নামে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে তা আপাত দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক মনে হলেও তার পশ্চাতে রয়েছে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহন ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তির চিন্তা। এই সকল অশুভ শক্তির বিনাশ করতে এবং ঐক্য, সৌভাত্র অখণ্ডতা ও স্থিতিশীলতা অথুন্ন রাখতে, শোষণ মুক্ত সমাজ তৈরী করতে ও পরনির্ভরশীলতা দূর করতে ভারত তথা বিশ্বে, নিরলস বিরামহীন যোদ্ধারূপে সংগ্রাম করে দেশের বনিয়াদকে ও বিশ্বের মর্যাদাকে উন্নত করতে বিশ্ববরেণ্য নেত্রী প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজের রক্ত দিয়ে চির বিদায় নিয়েছেন। যেমন দেশের বনিয়াদকে মজবুত করতে

ও ষড়যন্ত্রের পথে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়কে ভূমিসাৎ করার বিশ্বের মহান রাজনীতিবিদ মহাত্মা গান্ধীকেও প্রথম স্বাধীনতার ভারতে হিংসার বলি হতে হয়েছিল। এঁদের হত্যাকাণ্ডে জাতির মর্যাদা, সম্মান, আদর্শ, আত্মসচেতনতা ও ধর্ম নিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। শ্রীমতী গান্ধী ভুবনেশ্বরে জীবনের শেষ ভাষণে দেশবাসীকে আবেদন করেছেন, "স্বাধীনতাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করুন।"

আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে সফল হয়েছিলাম কেন? আমরা হিংসার পথ পরিহার করেছিলাম বলে। আমরা সকলেই স্বাধীনতার ইতিহাস গ্রহণ করছি না এবং জানবার আগ্রহও নেই। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে নৈতিকতার অধঃপতন, সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয়, জাতীয়তা বোধের অভাব ও চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে। পুনরায় এই আত্মিক শক্তি ও বোধকে জাগরিত করতে হবে।

আমরা আশা করি প্রয়াত নেত্রীর রক্ত থেকে উজ্জীবিত হবে এক ঐক্যবদ্ধ সুন্দর সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী শক্তিশালী জাতীয় চেতনার অঙ্কুর জাগবে, যেখানে থাকবে না শোষণ, হিংসা বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। দেশকে ভালবাসলে ও দেশকে বড় মনে করলে জনসাধারণের শপথ হোক দারিদ্র মোচনের শিক্ষা প্রসারের শপথ হোক আর রক্ত ঝরতে দেব না, ধর্মকে, জাতকে জাতিকে রাজনীতিতে কলুষিত করব না ও শপথ হোক শোষণ মুক্ত সমাজের আর চরিত্র গঠন করলেই বীরের রক্ত স্রোত, মাতার অশ্রুধারা শহীদের আত্মত্যাগ সকলই সফল হবে।

সংস্কৃতের ঐশ্বর্য

উত্তম কুমার সমাদার
শ্রেণী—XI, রোল নং-104
বিভাগ—কমার্স

ভারতীয় সভ্যতার আলোচনায় ন্যায়, দর্শন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ছন্দ, অলঙ্কার জ্যোতিঃশাস্ত্র, তর্ক প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। জগতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য, বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি এই সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত। সিন্ধু সভ্যতার আলোচনায় তাদের কথ্য ভাষা সংস্কৃত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (কাল প্রবাহে সিন্ধুদেশের ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন কি সংস্কৃত লিপিতে যাইয়া তাহারা আরবী হরফ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছে।) রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনে সংস্কৃত ভাষার উপরে অকথ্য অবিচার হওয়ার কথাও ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহের জননী এই সংস্কৃত (দেব ভাষা) বলিয়া আমরা অবগত আছি। সংস্কৃত ভাষার অক্ষরসমূহ উচ্চারণ পদ্ধতি অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচায়ক। আমাদের পূর্ব পুরুষগণের জ্ঞান বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও দর্শন সমূহের ফলশ্রুতি এই দেব ভাষায় সংরক্ষিত আছে। এমন কি অর্থনৈতিক বিষয়ে কৌটিল্যের অভিমত সমগ্র জগতে সমাদৃত। জ্যামিতি ও বীজগণিত প্রথম দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নৈসর্গিক, ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ভাষা চলমান সভ্যতার এক উৎকৃষ্ট বাহন। ভাষা মিলনের সূত্র। এই ভাষার রস মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া জগতে অসংখ্য মনীষী সংস্কৃত আলোচনার দ্বারা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অন্ধকার দিনে আমরা বেদের আলোচনায় যে সন্ধান পাই তাহা জার্মান মনীষী। Maxmular-এর দান বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জনসাধারণে প্রচারিত অধ্যায় এক সময় প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল উহা বিদগ্ধ সীমাবদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই আলোচিত হইত। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতি মহামতি স্যার জন্ উড্রফ তৎকালীন তান্ত্রিকাচার্য্য পণ্ডিত প্রবর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহোদয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই অধ্যায়ে অভিজ্ঞ হন এবং জনসাধারণে তাহা প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংস্কৃত সাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট ধর্ম গ্রন্থ। উহা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী কবি উইলসন্ মহোদয় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছেন—

"অমৃতংমধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোধিকম্।
দেব ভোগ্যমিদং যস্মাৎ দেব ভাষেতি কথ্যতে॥

(সাইভিশ)

ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদেব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্ ॥
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥

বর্তমানে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষার অমূল্য সম্পদ বেদ বেদান্তাদি লইয়া বিদেশে পরিমাণে চর্চা হইতেছে। জার্মান, জাপান প্রভৃতি দেশে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থগুলি লইয়া গবেষণা চলিতেছে। শুধু তাহাই নহে বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের টীকা গুলি প্রচার করা হইতেছে। অনেক দেশে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা এখন হইতেছে। সুতরাং ঐতিহ্যপূর্ণ এবং প্রভূত ঐশ্বর্যশালিনী এই সংস্কৃত ভাষার প্রতি দেশবাসীর তথা সরকার মহোদয়ের যথাযথ দৃষ্টি ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। নচেৎ অচিরেই সংস্কৃতির সৌধটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে। পরিশেষে, স্বামী বিবেকানন্দের সুরে সুর মিলি আমরা বলিতে পারি—"ভারতবর্ষের মর্যাদা ও সংস্কৃত ভাষা সমার্থক।'

রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে পরিচিত এক বিপ্লবী

মন্দিরা দে
একাদশ শ্রেণী (Arts)

ভারতবর্ষের এক প্রান্তের বিপ্লবী সূর্য সেন জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে কি ভ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে খবর জানাবার জন্যই এই লেখা।

সূর্য সেনের তখন মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম জেলের মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত আসামী জন্য নির্দিষ্ট, অন্য আসামীদের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক 'সেল' থেকে 1933 সালের ৪ আ তাঁর দাদাকে তিনি লিখলেন—

For Surja Sen
Condemned Prison
Chittagong Jail
8-8-33

শ্রীচরণ কমলেষু দাদা,

...মানুষের মন একা কিছুতেই থাকতে চায় না—সে নিজের সাথী জুটিয়ে নেবেই। মনও ২-৪ দিনের মধ্যেই প্রকৃতির মধ্যে থেকে নিজের সঙ্গী জুটিয়ে নিল। সেই সঙ্গী হচ্ছে

trees, the sky and the moon. যেদিন চাঁদ দেখা যেত না, সেদিন তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতাম। এইভাবে পনেরো দিন কেটে গেল। তখন আপনার প্রেরিত তিনখানি বই—গীতা, মহাভারত এবং চয়ণিকা পেলাম। আমার most favourite এই তিনখানা বই তখন আমার additional সঙ্গী হল। প্রকৃতির জিনিসগুলি থেকে এবং এই তিনটি বই থেকে মনের খোরাক সংগ্রহ করে মনটাকে ভরিয়ে রাখলাম —···

ইতি—

আপনার স্নেহের সূর্য

(বিপ্লবী মহানায়ক—সূর্য সেন :—তুষার কান্তি দাশগুপ্ত ও দিলীপ কুমার সেন, পৃঃ ২৬২)

কয়েকদিন পরে বৌদিকে লিখলেন—

স্নেহময়ী বৌদি,

···আমার এ পারের পথ চলা হয়তো শেষ হয়ে এল, পার হওয়ার আশায় ঘাটে বসে আছি ; তারপর ওপারের পথ চলা শুরু হবে ।—এই জন্যে নিজেকে তৈরী করছি—

দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয়— আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়।

(বিপ্লবী মহানায়ক—সূর্য সেন ।—তুষার কান্তি দাশগুপ্ত ও দিলীপ কুমার সেন, পৃঃ ২৭৬)

এর আগে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণের ১২ দিন পরে বিজয়া দশমীর দিন র্য সেনের 'বিজয়া' নামে একটি আত্ম জীবনীমূলক রচনায় এ লেখাটি পাওয়া যায়—গ্রেপ্তারের য়ে তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য কাগজ পত্রের মধ্যে এটি পাওয়া যায়—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে ।"

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কতো বিজয়াই তো এসে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর

অন্য বিজয়ার মধ্যে কতো তফাৎ—এবার কার বিজয়া যেন সবচেয়ে মূল্যবান। জীবনে যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি এমন কতো অভিনব জিনিস নিয়েই বিজয়া এল আজ আমার কাছে—

আড়াই বছরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এল, এর মধ্যে কতো অন্তরঙ্গ বন্ধু, কতো আদরের ভাই বোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম—

নরেশ, বিধু, টেগরা, মধু, প্রভাস, নির্মল, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে, কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম, কতো স্নেহময়ী জননীর বুক শূণ্য করে তাঁর সোনার পুত্তলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতী দিয়েছি। এ সবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে, পনেরো দিন আগে যে নিখুঁত, পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অনুকূল দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে। ...আজ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি আমার মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলেছে—চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না—চাপিতে গেলে উঠে দুকুল ছাপিয়া।

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হয় তিমির রাতে
তরণী খানি বাহিয়া।

('চট্টগ্রাম : বিপ্লবের বহ্নিশিখা'—শচীন্দ্রনাথ গুহ, সম্পাদিত)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স কত ?

মহম্মদ আব্দুল্লাহ্
বি-এস-সি (দ্বিতীয় বর্ষ)
পদার্থ বিজ্ঞান সাম্মানিক বিভাগ

বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত বিশাল তার নিঃখুত ধারণা করা অসম্ভব। নক্ষত্রবিদরা এই বিশালত্বের সামান্য একটু হদিস দিয়েছেন। সৌরমণ্ডলের দূরপ্রান্তের গ্রহ প্লুটোর কক্ষ যদি ১৫০০ ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত হয়, তা হলে আমাদের পৃথিবীর অবস্থান সেই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু মাত্র। আবার নক্ষত্রবিদদের জানা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামান্য অংশের যদি একটি ২৫ মাইল লম্বা ও ২৫ মাইল চওড়া ম্যাপ তৈরী করা যায় তাহলে আমাদের সৌরমণ্ডলের অবস্থান সেখানে একটি বিন্দুর থেকে বেশী নয়।

এই সৌরমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে সূর্য সমেত দশটি গ্রহ, অনেকগুলি উপগ্রহ, পাল্লাস, জুনো, হার্মিসঅস্ত্রোয়া প্রভৃতি নামের দেড় হাজারেরও বেশী গ্রহাণুপুঞ্জ, ইতস্তত সঞ্চারমান অগণ্য উল্কাপিণ্ড বা মিটিওর। আর এই মহাবিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে রয়েছে সূর্যের মত বা সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড় অসংখ্য নক্ষত্র বা তারকা, যেমন ক্যাসিওপিয়া, ভেগা, প্রক্সিমা সেন্টরী, আলফা সেন্টরী, বিটা-হারকিউলিস—এমন আরও কত বিচিত্র নাম তাদের। আলফাস্করপাই অঞ্চলের এন্টারাস নক্ষত্রটিই সূর্যের চেয়ে 10^6 গুণ বড়, আর পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হল ৩৮০ আলোকবর্ষ যেখানে ১ আলোকবর্ষ = (১,৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫) মাইল। এরপর আছে ঐরকম বহু বড় বড় নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে তৈরী এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি। কয়েকটি অতি-পরিচিত গ্যালাক্সির নাম হল M-81, সিগনি-২৫, সেন্টারাস, অ্যাডম্যাণ্ডো ইত্যাদি। অধ্যাপক পেরীন ৩ লক্ষ গ্যালাক্সির কথা বলেছিলেন, পরে সংখ্যাটা ১০ লক্ষে দাঁড়ায়, এখন এদের সংখ্যা আরও অনেক অনেক বেশী। এক একটি গ্যালাক্সি অতিক্রম করতে আলোরই লাগে পঞ্চাশ হাজার বছর বা তারও বেশী। অ্যাডম্যাণ্ডো নীহারিকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সি থেকে আলোক আমাদের পৃথিবীতে আসতেই সময় নেয় মাত্র ৯ লক্ষ বছর। ভাবা যায়! যেখানে সূর্য থেকে আলোক পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় ৮ মিনিট।

এই শেষ নয়, বিজ্ঞান মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলল দূরে আরও দূরে। যেখানে যে অকল্পনীয় দূরত্বে পৌঁছতে আলোর গতিবেগেই সময় লাগবে দশ কোটি বছর। দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমায় বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেলেন সুপার ষ্টার কোয়েসার, পালসার, ব্লাক হোল বা কালো গহ্বর কোটি

কোটি মাইল পুচ্ছ সমন্বিত অগণিত কমেট বা ধূমকেতুর। তাঁরা ধারণা করলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডেই কোথাও লুকিয়ে আছে বাস্তব জগৎ ও বস্তুর প্রতিরূপ জগৎ যাকে অ্যান্টি ম্যাটার জগৎও বলা যায়।

এই হল আমাদের জানা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোটামুটি একটা ধারণা—এরই বয়স কত সেই প্রশ্ন বিজ্ঞানীরা তুলেছিলেন বিশ শতকের গোড়ার দিকেই। ভূপৃষ্ঠের বহু নীচের আদিম শিলাস্তর প্রভৃতির বয়স নিরূপণ করে বলা গিয়েছে পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বছর। প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল বেগে ২৭ কোটি মাইল কক্ষপথে হাজার বার ঘুরতে কত সময় লাগে সে হিসাব থেকে সূর্যের বয়সও না হয় বলা গেল, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড? তার বয়স বার করা হবে কি ভাবে।

বিজ্ঞানীরা একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে এগোলেন এই দুরূহ কাজে। বিভিন্ন গ্যালাক্সি থেকে পাওয়া আলোর লোহিতপসারণ (red shift) বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখলেন যে একটা গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জ আর একটা গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক যেমন বেলুন ফোলাতে থাকলে তার উপরের দুটি রঙের ফোঁটা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যায়। ল্যামিট্রি, এডিংটন, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা 'একটা অণু বা অ্যাটম থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি' এমনটা কল্পনা করেন। পরে এর উপর ভিত্তি করে 'big bang' তত্ত্ব গড়ে ওঠে ও বহুবিধ জটিল গণনার মাধ্যমে দেখান হয় যে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স পাঁচ থেকে দশ হাজার মিলিয়ন বছর।

কিন্তু কিছুকাল পরেই এই থিওরীর বহু গুরুতর ত্রুটি লক্ষ করা গেল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখালেন যে আমাদের গ্যালাক্সির বয়সই দশ থেকে পনের হাজার মিলিয়ন বছর। যা যাই হোক, ব্রহ্মাণ্ড তারই একটা অংশের চেয়ে কম বয়সের এটা বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া 'একক উৎপত্তি' বা 'singular origin' তত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক বিজ্ঞানী তীব্র বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন তাহলে পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্ত ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিতে হয় আর 'space time' কথাটাও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

যাই হোক, এর পরে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী হয়েল এবং ভারতীয় বিজ্ঞানী নারলিকার তাঁদের 'steady state' তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁরা বলেন ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল এমনই ছিল আর থাকবেও এমনটাই। red shift বা লোহিতপসারণের ব্যাখ্যায় তাঁরা বললেন গ্যালাক্সিগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে গেলেও ব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্যের কোন হেরফের ঘটছে না কেননা নূতন নূতন গ্যালাক্সির উদ্ভব এবং ধ্বংস চলছে সবসময়। দেখা গেল এই তত্ত্ব শক্তির নিত্যতা সূত্রও লঙ্ঘন করে না। এই তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের তথাকথিত বয়সের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

অনেক বিজ্ঞানী মেনেও নিয়েছিলেন এই তত্ত্ব। কিন্তু গোল বাঁধল ৬০-এর দশকে সুপারষ্টার কোয়েসার আবিষ্কার হওয়ার পর। সাধারণত নক্ষত্র বা তারকা থেকে আমরা কি পাই?

নিশ্চয়ই আলো পাই, কিন্তু মজার কথা হলো এই সব অতিনক্ষত্র বা কোয়েসার থেকে আমরা পাই রেডিও তরঙ্গ। ১ মিলিয়নের মধ্যে কেবলমাত্র একটি গ্যালাক্সিই এমন রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করতে পারে। সুতরাং হয়েল নারলিকার-এর 'Steady state' তত্ত্ব অনুসারে এই রেডিও তরঙ্গ উৎপাদনকারী গ্যালাক্সির সংখ্যা বহু বছর আগে ও পরে একই থাকবে। কিন্তু বাস্তবে বিস্তৃত পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে দেখা গেল কোয়েসারের সংখ্যা ঘনত্ব পরিবর্তনশীল। সুতরাং এই তত্ত্বও টিকল না।

অত্যাধুনিক গবেষণা কিন্তু আংশিক ভাবে আগের সেই 'Surigular origin' তত্ত্বকেই সমর্থন করে। তবে ঐ তত্ত্বের বহু মৌলিক ত্রুটি দূর করা এখনও সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানী হয়েল 1965 সালে বলেছেন হয়ত তাঁর তত্ত্বে কিছু ভুল আছে। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স বিলিয়ন কোটি বছর বা তার বেশীই হবে। বর্তমান গবেষণায় যে সঠিক বয়স পাওয়া যাচ্ছে না এর মূলে কতকগুলি কারণ রয়েছে। আলোকের লোহিতপসারণ মাপার যেমন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে রেডিও ওয়েভের সে রকম কোন পদ্ধতি নেই। তাছাড়া কোয়েসর রহস্যের সমাধান আজও হয়নি, দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমায় অবস্থিত ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক থেকে অতি শক্তিশালী বিকিরণের ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানীদের কাছে প্রহেলিকা। দীর্ঘ কুড়ি বছরের গবেষণায় দেড় হাজারেরও বেশী কোয়েসারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ডপলার প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় লোহিতপসারণ হচ্ছে তা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়া দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় নি।

মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুকণার গঠন সম্পর্কে পরমাণু কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান নতুন নতুন আলোকপাত করছে যার ফলে মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কিত তত্ত্বের বয়ানের পরিবর্তন হতে বাধ্য এবং এই পরিবর্তন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও অনেক প্রভাব ফেলবে।

আমরা অপেক্ষা করে আছি নূতন কোন চিন্তাভাবনার জন্য, নূতন কোন যুগান্তকারী পরীক্ষার (experi) জন্য, বিজ্ঞান মানসিকতায় নূতন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য যা পুরানো চিন্তাধারাকে, পুরোনো ধ্যান ধারণাকে প্রতিস্থাপিত করে বলবে—

হেথা হতে যাও পুরাতন
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে
আবার বাজিয়ে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি
বসন্তের বাতাস বহিছে।

॥ ভারতবর্ষ যেন টুকরো না হয় ॥

মধুর প্রামাণিক (পত্রিকা সম্পাদক)

[illegible] (দ্বিতীয় বর্ষ)

[illegible]

ভারতীয় সংবিধানে বলা আছে যে সকল জাতি সকল ধর্ম ও সকল বর্ণের মানুষ সমান এবং এই সংবিধানে প্রত্যেকেই সম সুযোগ দেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু আজ তিন দশক, স্বাধীনতার পরেও সরকারের সেই নিয়ম চালু আছে যার দ্বারা সংবিধানের উপরোক্ত নির্দেশের কোন [illegible] ঘটে। এই বিশেষ নিয়ম বলে ভারতের তপশিলী জাতি ও উপজাতীয় লোকেরা কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। যেমন—

১। বিদ্যালয়ে উপরোক্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু সিট সংরক্ষিত থাকে।

২। বিভিন্ন কাজে উপরোক্ত শ্রেণীর চাকুরীরা সরকারের কাছে অনুদান পেয়ে থাকে।

৩। চাকরীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু পদ সংরক্ষিত থাকে।

৪। চাকরীর জন্য দরখাস্ত আবেদন পত্রের সহিত যে পোষ্টাল অর্ডার দেওয়া হয় তাহাতে ছাড় দেওয়া হয়।

৫। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে [illegible] থাকা উপরোক্ত ছেলে-মেয়েদের দেওয়া হয়।

এইরূপ অসংখ্য ব্যাপারে উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরা নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

[এই সকল সুযোগ সুবিধা উপরোক্ত শ্রেণীর অবশ্যই পাওয়া দরকার এটা নিশ্চয় বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে তপশিলী জাতি ও উপজাতীয় লোক হইলেই উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হওয়া উচিত না।] কারণ উপরোক্ত শ্রেণীর অনেক পরিবার আছেন যাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল। সুতরাং এই ধরনের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা না পাওয়া উচিত। কিন্তু সরকারের ভুল নীতির ফলে যে সকল তপশিলী জাতি ও উপজাতী পরিবারের মাসিক আয় ৩০০ টাকা বা তারও কম তারা সরকারের কাছে যে সুযোগ পেয়ে থাকেন, সম সুযোগই পেয়ে থাকেন তারা যাদের মাসিক আয় দুই অথবা তিন হাজার টাকা কিম্বা তারও বেশী। কিন্তু এমন অনেক সাধারণ পরিবার আছেন যারা আর্থিক দৈন্যতার জন্য ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না অথবা পাঠিয়েও মাঝপথে পড়াশুনা থামিয়ে দিতে বাধ্য হন [illegible] অনেক কষ্টে পড়াশুনা করেও পোষ্টাল অর্ডারের অর্থ না থাকায় তারা চাকরীর জন্য আবেদন করতে পারেন না। এই সকল নানা কারণে সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েদের [illegible]

অবহেলিত বোধ করছেন এবং অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে সরকারের গৃহীত উপরোক্ত নীতি ভ্রান্ত বলে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে এবং গুজরাট রাজ্যের আন্দোলন তাহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের কথা মনে পড়ছে। এই সরকার যখন কাল চামড়া থাকার জন্য যখন কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার করে তখন আমরা ভারতীয়রা স্বভাবতঃ বেশী লজ্জিত হই এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু সেই ভারতবর্ষেই জন্ম তথা জাতের ভিত্তিতে যখন এক শ্রেণীর লোক কতগুলি সুযোগ পাওয়ার অধিকার লাভ করে এবং আর এক শ্রেণীর লোক সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তখন আমরা কেন লজ্জিত হই না।

আজ সাধারণ ঘরের দরিদ্র ছেলে মেয়েরা চলার পথ পরিষ্কার না দেখে যত নিজেদের অসহায় বোধ করছে ততই এরা তপসিলী জাতী ও উপজাতীয় লোকেদের ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করছে। কিন্তু গান্ধিজী চেয়েছিলেন এমন এক ভারতবর্ষ যেখানে কোন জাত, কোন বর্ণ অথবা কোন ভাষাভাষির মানুষ থাকবে না থাকবে শুধু ভারতবাসি আর ভারতবর্ষ। কিন্তু সরকারের গৃহীত নীতির ফলে গান্ধিজীর সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজও গড়ে উঠতে পারে নি, পরিবর্তে সাধারণ ঘরের দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের মনে গড়ে উঠেছে জাতী ও বর্ণ ভেদের সংকির্ণতা যার জন্ম কেবলমাত্র হতাশা থেকে। সুতরাং সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির অবিলম্বে বিলোপ-সাধন করা উচিত নতুবা হয়ত অচিরেই ভারতবর্ষ গুজরাটে পরিনত হবে যার সুযোগ গ্রহন করবে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তি।

তাই ভারতবর্ষ যাতে অচিরেই গুজরাটে পরিনত হতে না পারে তার জন্যে সরকারের উচিত উপরোক্ত নিয়মের বদলে এমন এক নিয়ম চালু করা যার বলে প্রথমোক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি সর্ব-স্তরের সেই সকল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পাবেন যাদের অর্থনৈতিক বিচারে দুর্বল বলে সরকার ঘোষণা করবেন। এর ফলে একদিকে যেমন দরিদ্র অসহায় সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা আশার আলো দেখতে পাবে অন্যদিকে জাতী ও বর্ণ ভেদের উপর চরম আঘাত হানা হবে।

'কুসংস্কারের কবলে দিকপালেরা'

অনুপ কুমার ঘোষ
বি-এ, (দ্বিতীয় বর্ষ)

দেখা যায় মানুষ যতই দুর্বল হয়, অন্তত: মনের দিক থেকে ততই কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে। সংস্কারের প্রভাব কাটানো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কেননা তার পেছনে থাকে ধর্মীয় প্রভাব বা অনুরূপ কোন সত্তার শেকড়গাড়া বিশ্বাস। এই কুসংস্কারই আমাদের সমাজকে অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরে আছে। এর কবল থেকে কারুরই নিস্তার নেই। এই কুসংস্কারকে লঙ্ঘন করে সমাজের দিক থেকে তাকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, কিন্তু এই কুসংস্কারের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে সমাজ জীবন তথা ব্যক্তিজীবনের উন্নতি অসম্ভব? কিন্তু এই কুসংস্কারের পক্ষে তো কোন যুক্তি খাড়া করা যায় না। তাই কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের মতো আচ্ছন্ন করে রাখে মানুষকে। এতো গেল আমাদের কথা। কিন্তু জ্ঞান গরিমায়, প্রতিভা পরাক্রমে যারা ইতিহাসে দিকপাল হিসেবে চিহ্নিত, তারা কি সত্যিই দুর্বল চিত্ত? তাই যদি হয় তাহলে তারা কি করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্থাপন করে গেছেন তাদের কীর্তির আকাশচুম্বী মিনার। এমন যুক্তি অবশ্য খাড়া করা যায় যে জীবনের কোন মুহূর্তে দুর্বলচিত্ততায় সবাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তারাও হয়েছেন। কিন্তু এই যুক্তি কি সত্যিই যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায়। তাদের তো নিশ্বাস প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছে সমস্যার শেকড়। এই সমস্যার শেকড়গুলোকে বীরের মত মূলোৎপাটিত করেই না তারা গড়ে তোলেন কীর্তির সুউচ্চ স্তম্ভ।

মহান 'অ্যারিষ্টটল্' বলেছেন, দম্ভ থেকে তফাৎ যাও, বিশেষ করে ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কিছু করতে যেও না। তা করলে জেনো তুমি যা করতে চাও অশুভ শক্তি তা কেড়ে নেবে। এতো গেল মহান দার্শনিকের চেতনা বোধের কথা। কিন্তু দিগ্বিজয়ী 'আলেকজাণ্ডার'কে গণৎকাররা যখন বললেন : মহারাজ যাই করুন ব্যাবিলনের মাটিতে পা দেবেন না, তখন তার বীর্যবত্তার কাছে সেটা হয়ে উঠল একটা চ্যালেঞ্জ। তিনি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন সদর্পে। কিন্তু চেতনা আচ্ছন্ন করে পাক খেতে লাগল বিশ্বাসভাজন গণৎকারের সাবধানবাণী। এবং তারই প্রভাবে তিনি ডুবে গেলেন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে, কেননা তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তার অন্তিমলগ্ন আর দূরে নয়। সত্যি সত্যিই তিনি অচিরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন। এ যেন কুসংস্কারের পায়ে আত্মাহুতি দেওয়া। সেদিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা জুলিয়াস সীজার। ৪৪ খৃঃ পূঃ তার জীবনের শেষ রাত্রির দুঃস্বপ্ন তাকে আতঙ্কিত করলেও মনের জোরকে কিন্তু, আদপেই আচ্ছন্ন করতে পারে নি। পারে নি শুধু নয়, সেই দুঃস্বপ্নকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে

তিনি ধরলেন কুসংস্কারবিরোধী পথ। পরের দিন তার অভিষেক অনুষ্ঠান বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কয়েকজন শুভাকাঙ্খী। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এমন কি পথিমধ্যে সেনেটে যাত্রাকালে জনৈক গ্রীক পথচারী তার শকটের নিকটবর্তী হয়ে তার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি শুনেও শোনেননি। বস্তুতঃ তিনি যে কখনও প্রত্যাবর্তনে অভ্যস্ত ছিলেন না। সাফল্য কি অবিশ্বাস্যভাবেই না তার করায়ত্ত হয়েছে এতদিন। আত্মবিশ্বাসও দম্ভের প্রতিমূর্তি সিজার এগিয়ে গেলেন নিয়তির দিকে। কিছুটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে অন্ততঃ সেদিনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি নিহত হতেন না।

রাজা 'দ্বিতীয় চার্লসের আচরণও কি বিস্ময়কর নয়? দেশত্যাগ করার আগে তিনি শরনাপন্ন হলেন গণৎকারের। কোন পথে নিষ্ক্রান্ত হলে তিনি বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হবেন না। তার রাজসুলভ প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও শৌর্যবত্তা সেই সংকটময় মুহূর্তে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কু-সংস্কারে। ট্রাফালগার যুদ্ধের নায়ক ব্রিটিশ সেনাপতি নেলসন যুদ্ধ জাহাজ ভিকট্রির মাস্তুলে কেন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন ঘোড়ার ক্ষুর? অন্ততঃ গ্রহের প্রভাব মুক্ত হতে অবশ্যই। ফরাসী সম্রাট 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টি'র' কার্যকলাপ তো আরও বিচিত্র? সামান্য সৈনিক থেকে ধাপে ধাপে যিনি উঠেছিলেন গৌরবের উচ্চশিখরে, তিনি তো প্রতিটি পদক্ষেপে মাদাম নর্মাণ্ডের পরামর্শ নিতেন। এবং তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল সেই ছোটখাট মায়াবী মানুষটি, 'লিটল রেড ম্যান' নামে যিনি ইতিহাসে অভিহিত। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই ঐতিহাসিক উক্তি: বিদ্রোহ যতদিন, আমিও ততদিন—জয় এলে দেখবে আমি নেই। কি অবিশ্বাস্য ভাবেই না ফলে গিয়েছিল। এই উক্তির পিছনে কোন গণৎকার ছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। আর 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া?' তিনি যখন যুবতী রাণী। লর্ড মেলবোর্ণের প্রতি তার দুর্বলতার কথা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। সেই লর্ড মেলবোর্ন যখন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কূটনৈতিক সফরে বিদেশে তখন মহারাণীর বিশেষ দূত তার হাতে তুলে দেয় মহারাণীর পত্র। পত্রের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত মোড়কটি যথারীতি পৌছাল লর্ডের হাতে এবং একটি চিরকূটও। মহারাণী লিখেছেন: It will keep you from all evil and will make me very happy if you will put if with your keys··· ··

ছোট বস্তুটা কি তা অবশ্য জানা যায় না। তবে সেটা যে কোনরকম তুকতাকের বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই তুকতাক ছিল বিচিত্র ধরণের। থিওডোর রুজভেল্ট তনাবার পঞ্চ অঙ্গুলির এক বিশেষ ভঙ্গিমা, ইতিহাসে যা 'Mano Cornuts' নামে উল্লিখিত ছিল প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের রক্ষাকবচ জেনারেল আইসেন হাওয়ার, ধনকুবের রকফেলার ও ইতালীয় কম্যুনিষ্ট নেতা তোগলিয়াত্তি পকেটে রাখতেন যথাক্রমে একটি বিশেষ স্বর্ণমোহর, ঈগলপাখির-বাসায় পাওয়া একটি

প্রত্যেকেও স বাকানো পেয়েক। সেনেট'র কেনেডি নিহত হওয়ার কিছু আগে আমন্ত্রণে মিলিত হয়েছিলেন রুশ কবি য়ার্তুশেঙ্কোর সঙ্গে। রুশ প্রথানুযায়ী পানান্তে পানপাত্র নি... করেছিলেন দুজনেই। পানপাত্র দুটি চূর্ণ হওয়াই ছিল অভিপ্রেত। কিন্তু এই নিক্ষেপে পাত্র... টিকে যায় বহাল তবিয়তে। চরম দুর্ভোগের আশঙ্কায় শিহরিত কবি য়ার্তুশেঙ্কো লিখেছেন—

I have always been supertitions and a terrible foreholding pass... through me. I looked at Robert Kennedy. He had turned pale. Probab... he was supertitions.

কুসংস্কারাশ্রয়ী দিকপালদের তালিকায় আরও বহু নাম সংযোজিত হতে পারে। সভ্যতা... বিকাশ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও রুদ্ধ হয়ে যায়নি কুসংস্কারের প্রতি আনুগত্য।

'আমরা কতটুকু স্বাধীন'

স্মৃতি দে

B. A. (I Years)

ক্রমিক সংখ্যা-২১

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই সমাজের সৃষ্টি। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে চায়। তার এই সহজাত আকাঙ্খা সমাজের ভিত্তি। এই আকাঙ্খাই আমাদের বন্ধুত্বের প্রেরণাকে উজ্জীবিত করে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত, প্রগতিবাদীকে বলতে শোনা যায় বন্ধুত্ব মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সহজাত প্রবৃত্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে আমরা পারি কি? দেখা যাক, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা কি বলে?

প্রতিদিন সকালে একই বাস স্টপ থেকে কলেজে যাই এবং ক্লাসযখন অফ থাকে একই সঙ্গে ফিরি। বেশ কয়েকজন আছেন, যাঁরা ওই একই সময়ে একই বাসে যায় এবং কলেজেই থাকে। কিন্তু আমরা বদনাম পেয়ে পরস্পরকে বেশ ভালভাবে চিনলেও কখনও কথা বলা ত দূরের কথা হাসিও না। দু'একজন আবার আমার সঙ্গে একই জায়গায় নেমে একই পথ দিয়ে হেঁটে গন্তব্যে যান। কখনও হয়তো সামনে দেখলেও তাকে গ্রাহ্য করি না। সুযোগ পেলেও সাহায্য করি না। এই না চেনার খেলায় আর একটা মজার জিনিস আমি বেশ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছি। পরস্পরের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা দেখান অভদ্রতা হেঁসে কথা বলে সৌজন্য দেখান অবাঞ্ছনীয়। অতএব পাশাপাশি আমরা সব দাঁড়িয়ে থাকি, নিঃশব্দ, এক এক সামাজিক দ্বীপ। সংস্কারের সমুদ্র মধ্যস্থলে— আর মনে দুঃখ পাই আমরা মিশতে সুযোগ পাই না বলে।

তাঁ। সবাই আমরা দুঃখ পাই অবাধ সুন্দর সহজ মেলামেশার পথ আজও আমাদের সমাজে নেই বলে, অনেক ধরণের সমাধানের চেষ্টা দেখছি এই একাকিত্বের—ক্লাবে যাওয়া, পার্টি দেওয়া, পাড়াবেড়ান—কি সব অকর্মসাধ্য পথ কিন্তু সব থেকে যে পথটা সহজ সংস্কার মুক্ত হয়ে পাশের লোকের সঙ্গে (সে মহিলাই হোক আর পুরুষই হোক) কথা বলা সে পথটাতেই আমাদের যত ভয়, যত বাধা, আমার সত্যিই খুব অবাক লাগে—যে দেশে কতদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকার মেয়েকে ভগিনী বলে ডাকতে পেরেছিল। যে দেশে প্রাচীন বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ পাশাপাশি বসে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে। সে দেশে কোন পথ দিয়ে এতখানি অনুদার আড়ষ্টতা ঢুকল, যা আজকের শত পাশ্চাত্য প্রভাব ও ম্লান করতে পারল না। কিছুতেই কেন আমরা ভুলতে পারি না নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, হাজার রকমের শাসন, পরস্পরকে শুধুমাত্র মানুষ ভাবতে কেন এত কষ্ট হয় ?

এই কৃত্রিম অনুশাসন যদিও আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে, তবুও তার কষ্ট বেশ। মেয়েদের সঙ্গে অপরিচিত পুরুষদের কথা না বলাটা অবশ্য প্রাচ্য সংস্কার। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষন থেকেও অনেকখানি একাকিত্ব আমরা পেয়েছি। ইনট্রোডিউসড্ না হলে কথা বলা ইংরেজ সমাজে বিরাট অসামাজিকতা। এ অবশ্য বেশ কিছুদিন আগের সাহেবী প্রথা। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্রিটিশ কায়দা আমাদের বাঙালীর উপর যে কি অস্বাভাবিক ভার চাপিয়েছে তা দেখার মতো কারণ আমরা বাঙালীরা অনেকটা ইতালীয়ান, ফরাসী প্রভৃতিদের মতো জাতীয় উত্তরাধিকার সূত্রে এক ধরণের সরল, স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতায় অভ্যস্ত। অচেনা লোক দেখলে বাঙালীর নিজস্ব স্বভাব নয় নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, স্বভাব বরং আগ বাড়িয়ে প্রশ্ন করা—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? কোথায় যাচ্ছেন ? ইত্যাদি। আবার, পাড়ার একজাতীয় বৃদ্ধরা যখন হঠাৎ রাস্তায় ধরে প্রশ্ন করেন, "কি কিনলে বাজার থেকে ?— তখন বিরক্ত লাগলেও মনে রাখতে হবে প্রকৃত বাঙালীর সমাজ চেতনার এই সবই প্রায় ফুরিয়ে আসা দু-একটি উদাহরণ এই স্রোতস্বিনী নদীর মুখে শাসনের বাঁধ বেঁধে তাই আজ—আমাদের এই দুরবস্থা। পাশ্চাত্য রীতিতে সভ্য হয়ে পাশের বাড়ীর, অচেনা প্রতিবেশীর সঙ্গে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি বটে, কিন্তু বাকপটু বাঙালী মনটা এই একাকিত্বের অভিশাপে কাঁদে।

পাশ্চাত্য মতের প্রভাব যদি একটা কৃত্রিমতার বোঝা আমরা কাঁধে তুলে নিয়ে থাকি। তাহলে সেই মতে মহিলা-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার নিয়মটা কেন শিখিনি ? এর বেলায়, দেখা যাচ্ছে। আমরা গোঁড়া প্রাচ্যবাদী। আধুনিক মেয়েরা অন্তঃপুর থেকে মনের জোরে ও গায়ের জোরে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু একটা সূক্ষ্মঅলক্ষ্য দেওয়াল তাদের চারিপাশে আজও খাড়া হয়ে আছে। প্রকৃত অন্তঃপুরিকার ন্যায় তারা পুরুষজাতির চোখের আড়ালে ঘোমটাটেনে থাকে না।

অথচ পাশে দাঁড়িয়েও তফাৎ রেখে মূক হয়ে থাকে। ফলে, সহজ মেলামেশার পথ বন্ধ হয়ে মানববৃত্তিগুলি অতি অসরল, জটিল ছায়াময় পথে আজ প্রবাহিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোন শহরের রাস্তাঘাটে। সুন্দরী মেয়ে দেখে তরুণ মনে চাকল্য জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু সামাজিক নিয়মানুবর্তিতার ফলে সেই চাকল্য কোনও তরুণকে আজও এগিয়ে দেয় না সহজ আলাপের পথে। সুস্থ সবল শিক্ষিত ছেলেরা কোন একা মেয়েকে দেখলে কখনও এগিয়ে এসে আলাপ করবে না, বরং দূরে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে তাদের নিয়ে উচ্চকণ্ঠে আজেবাজে মন্তব্য করবে। এ রহস্য বোঝা শক্ত। মধ্যবিত্ত সংযত স্বভাবের ছেলেরা তাই পড়েছে ভীষণ মুশকিলে। ভদ্র, শান্ত, নৈতিকচেতনা সম্পন্ন কোনও মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার পথ প্রায় বন্ধ বললেই হয়। কারণ 'ভাল' মেয়েরা যারতার সংগে কথা বলে না। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ, সহজ মেলামেশা দেখলে মনে আশা জাগতে চায় যে এরা হয়তো সমাজের এই আড়ষ্টতা দূর করবে। কিন্তু তখনই মনে পড়ে যায় যে—আজ যারা এত আড়ষ্টভাবে চলে তারাও তো কলেজ জীবনে ছেলেমেয়ে নির্বিচারে মিশতো হৈচৈ করতো।

এই জন্যই আমাদের সমাজে আজও স্ত্রী, পুরুষের সহজ বন্ধুত্ব প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। ছোটবেলায় আমার এক ঠাকুরমাকে বলতে শুনেছিলাম—"ছেলেমেয়েতে আবার বন্ধু হয় নাকি, ও হল ঘি আর আগুন।" এ ভাবার কথা বললে আজকের আধুনিক সমাজ জানবে কিন্তু তাদের মনোভাব আজও ঐখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। অতি শিক্ষিত ও শিক্ষিতা দুই ব্যক্তি যদি মনের ও মতের মিলের দরুন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। অথবা যদি তাদের বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার স্বপ্নকে বাস্তবের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই অতি প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ সে সম্বন্ধের একটা দৈহিক ও নৈতিক কাল অর্থ বড় করে তীর্যক দৃষ্টিতে তাদের দিকে কটাক্ষপাত করবে কিংবা তাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার গল্প তৈরী করে নিয়ে আলোচনা করবে। মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে আজকের এই ভয়ানক প্রগতিবাদী সভ্য যুগে কয়জন স্ত্রী জেনেশুনে স্বামীকে আর একজন মহিলার সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেবেন, কয়জন স্বামী সজ্ঞানে অধিকার দেবেন স্ত্রীকে অনাত্মীয় পুরুষের সংগে নিকট বন্ধুত্ব স্থাপন করতে? তাই কোন বিবাহিত ব্যক্তিকে যদি কোনও অনাত্মীয় মহিলার সংগে বেশ 'খোলাখুলিভাবে মিশতে দেখা যায় তাহলেই সমাজ সতর্ক হয়ে উঠে। কোন বিবাহিতা মহিলা যদি স্বামীর বন্ধুর সংগে বসে একটু বেশী গল্প করেন এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে। তাহলেই সামাজনীতি সজাগ হয়ে বলে—সাবধান শীঘ্র থামাও—এ দুরাচার! এ অসভ্যতা।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Vicious Circle—আমাদের অবস্থা এখন তাই। যুক্তি সম্পন্ন মুক্ত হৃদয় লোকেও অবচেতনে এই ধরণের বন্ধুত্ব বা মেলামেশার সম্বন্ধে একটা পাপবোধ থেকে গেছে। তাই নারী পুরুষে সহ বন্ধুত্ব আজ আমাদের সমাজের পক্ষে অসম্ভব। মেলামেশা এত দুর্লভ। এত শক্ত বলেই সে মেশায় একটা নিষিদ্ধতার ছায়া লেগে থাকে—হয়তো সহজভাবে মিশতে পেলে আজকের অনেক বিকৃত সম্বন্ধই শুধুমাত্র বন্ধুত্ব হয়ে উঠত।

বামদিক থেকে নীচে বসে—ইনসান আলি, সুবীর নন্দী, মানিক পাল, গৌতম দাস, দেবব্রত চক্রবর্তী (২য় সারি) বামদিক থেকে—দিলীপ ধর, মানিক সাহা, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অরুণ তলাপাত্র, উৎপল নন্দী।
উপরে (৪র্থ ৫ম) জয়ন্ত গোস্বামী ওলাউদ্দীন। টিম ম্যানেজার মৃণাল মৈত্র (উপরে ৩য়)

ক্রীড়া সংবাদ

শান্তিপুর কলেজে খেলাধূলার ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, তার সফল নেতৃত্বে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতায়, শরীর শিক্ষাবিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় কলেজের প্রতিটি ক্রীড়ানুষ্ঠান সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে অকপটে স্বীকার করছি যে ব্যাপকভাবে আমরা বিভিন্ন খেলাধূলার আসরে যোগদান করতে পারিনি, তার অন্যতম কারণ হল আমাদের আর্থিক অসঙ্গতি। নীচে ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার বিবরণ দেয়া হল—

শান্তিপুর কলেজ ফুটবল টীম (প্রাতঃ) 'প্রগতি সঙ্ঘ' আয়োজিত একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। পর পর কয়েকটি খেলায় একাধিক গোলের ব্যবধানে জয়লাভ করলেও সেমি-ফাইনালে টাইব্রেকার পরাজিত হয়। কিন্তু দিগ্‌নগরে 'নির্মলেন্দু (মিঠু) স্মৃতি শীল্ডে' কৃষ্ণনগর, হুগলী ও কলকাতার খ্যাতনামা দলকে একাধিক গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়ে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে শান্তিপুর কলেজ ফুটবল টীম 'জে. সি. মুখী' শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এ ছাড়া বহরমপুরে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ টীম যোগদান করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত খেলা স্থগিত থাকে ; সেই জন্যে আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের কাছে আন্তরিক-ভাবে দুঃখিত। আমাদের কলেজ টীমের পক্ষে অবতীর্ণ হল যথাক্রমে—অমরেন্দু কুণ্ডু, দিলীপ ধর, মানিক সাহা, জয়ন্ত গোস্বামী, শ্যামল বোস, দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, গৌতম দাস, পার্থপ্রতিম কর, ইমদাদ আলী, আলাউদ্দীন, উৎপল নন্দী, অরুণ তলাপাত্র, দেবব্রত সাহা, অমিত দেবনাথ, বিদ্যুৎ দাস, উত্তম ধর, সুবীর নন্দী, কাঞ্চন সাহা, গৌতম সাহা, কাজল সাহা প্রভৃতি।

আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রী পার্থপ্রতিম কর এ বছর 'নদীয়া জেলা ফুটবল' দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমরা শ্রী করের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

অপর একটি আনন্দের সংবাদ, এ বছর আমাদের কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মিলিত দল চাকদহ কলেজে একটি প্রীতি-ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করে ২-০ গোলে জয়লাভ করে। কাজেই বলা যেতে পারে শান্তিপুর কলেজের খেলাধুলা শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; খেলাধুলার সার্বিকক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যোগদান ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিপুল উৎসাহের বিষয়।

আর্থিক অসঙ্গতির জন্য শান্তিপুর কলেজ ভলিবল টীমের ট্রায়াল হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতে পারেনি। তবে আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রী অর্ণব খাঁ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ভলিবল ট্রায়ালে যোগদান করে দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমরা শ্রী খাঁ এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

কামনা করি। এরই কারণে কলেজ ক্রিকেট টীম কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। কলেজে আন্তঃ প্রীতি ক্রিকেট খেলার মধ্যে এ বছরের 'কলেজ ক্রিকেট' সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রী সোমনাথ অধিকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ট্রায়ালে অংশ করেন।

আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রী শৈবাল দাস জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যো অংশগ্রহন করে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আমরা শ্রী দাসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে আমাদের কলেজে আন্তঃশ্রেণী 'টেবিল্ টেনিস' ও 'ক্যারম' প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ২৮ ও ১৭২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। প্রাক্তন কৃতী খেলোয়াড়দের পরিচালনায় প্রতিযোগিতাগুলি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

● আন্তঃ শ্রেণী টেবিল টেনিস ঃ—

দিবা/ছাত্র	বিজয়ী—	অমিতাভ দাস
	বিজিত—	সঞ্জয় প্রামানিক
ঐ ছাত্রী	বিজয়িণী—	শিখা কর
	বিজিতা—	কৃষ্ণা গাঙ্গুলী
প্রাতঃ/ছাত্র	বিজয়ী—	মৃণাল মৈত্র
	বিজিত—	সুমিত বিট
কলেজ চ্যাম্পিয়ন	বিজয়ী—	অমিতাভ দাস
	বিজিত—	মৃণাল মৈত্র

● আন্তঃ শ্রেণী ক্যারম ঃ—

দিবা/ছাত্র	বিজয়ী—	জয়ন্ত বিশ্বাস
	বিজিত—	শঙ্কর ব্যানার্জ্জী
ঐ/ছাত্রী	বিজয়িণী—	ঝরণা নন্দী
	বিজিতা—	নীতীশা দাশগুপ্তা
প্রাতঃ/ছা	বিজয়ী—	অমিয় দত্ত
	বিজিত—	পার্থ প্রতিম কর
কলেজ চ্যাম্পিয়ন	বিজয়ী—	অমিয় দত্ত
	বিজিত—	জয়ন্ত বিশ্বাস।

শান্তিপুর সুতরাগড় স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত 'বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়' আমাদের ক

'এ্যাথলিট্ টীম' যোগদান করে। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে আমাদের কলেজের প্রতিযোগী যথাক্রমে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দীর্ঘ লম্ফে ১ম, ১০০ মিঃ দৌড়ে ৩য় ও লৌহবল নিক্ষেপে ২য় স্থান, প্রতুল সাহা দীর্ঘ লম্ফে ২য় স্থান, প্রদ্যুৎ কুমার দাস ৩০০ মিঃ দৌড়ে ৩য় স্থান; মানস কুমার নন্দী ৪০০ মিঃ দৌড়ে ১ম স্থান, মহিলা বিভাগে বেবী বসাক ডিসকাস নিক্ষেপে ৩য় স্থান অর্জ্জন করে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

১৯৮৪–৮৫ শিক্ষাবর্ষে আমাদের কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলেজের মাঠে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ ডঃ চুণীলাল কীর্ত্তনীয়া ও রাণাঘাট মহকুমা শাসক শ্রী কে. পি. সিন্‌হা। প্রতিবারের মত এবারের অনুষ্ঠানও উৎসাহোদ্দীপক ও উপভোগ্য হয়। প্রতিযোগীরা যথার্থ প্রতিযোগীসুলভ মনোভাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। কলেজের প্রাক্তন কৃতী খেলোয়াড়দের সুপরিচালনায় প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'অলিম্পিক রীতি' অনুসৃত হয়। প্যাভেলিয়নে উপস্থিত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বিশিষ্ট অতিথি ও প্রাক্তন কৃতী ছাত্ররা প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করেন। প্রতিযোগিতায় ৩৫২ জন ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে।

—ঃ—

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—৮৫

দিবা বিভাগ (ছাত্র)

১০০ মিঃ দৌড়
১ম অমরেন্দ্র কুণ্ডু
২য় দীপঙ্কর গোস্বামী
৩য় শ্যাম সিংহ

২০০ মিঃ দৌড়
১ম অমরেন্দ্র কুণ্ডু

উচ্চ লম্ফ
১ম প্রতুল কুমার সাহা
২য় আনন্দময় ঘোষ
৩য় প্রলয় গুহ

ত্রিস্তর লম্ফ
১ম ইস্‌কান্দার মির্জা
২য় বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

দীর্ঘ লম্ফ
১ম বৈদ্যনাথ বিশ্বাস
২য় প্রতুল কুমার সাহা
৩য় ইস্‌কান্দার মির্জা

লৌহবল নিক্ষেপ
১ম বিশ্বজিৎ বাগচী
২য় প্রতুল কুমার সাহা

দিবা বিভাগ ছাত্র ২০০ মিঃ দৌড়

২য় বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

৩য় গৌতম দাস

৪০০ মিঃ দৌড়

১ম অমরেন্দ্র কুণ্ডু

২য় বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

৩য় বিশ্বজিৎ বাগচী

১৫০০ মিঃ দৌড়

১ম বরুণ ঘোষ

২য় দিবাকর নাগ

৩য় গৌতম দাস

✪ বর্শা নিক্ষেপ

১ম শিখা কর

২য় কবিতা মুখার্জী

৩য় কৃষ্ণা গাঙ্গুলী

✪ ডিস্কাস নিক্ষেপ

১ম শিখা কর

২য় মুক্তিশ্রী কর্মকার

৩য় কবিতা মুখার্জী

✪ দীর্ঘ লম্ফ

১ম চন্দন পাল

২য় ইনসান আলী

৩য় জয়দেব কুণ্ডু

✪ ডিস্কাস নিক্ষেপ

১ম মৃণাল মিত্র

২য় অনিন্দ্য কুমার বসু

৩য় সুবীর নন্দী

প্রাতঃ বিভাগ ছাত্রী

১০০ মিঃ দৌড়

ত্রিকুর লম্ফ

৩য় জয়ন্ত গোস্বামী

✪ ডিস্কাস নিক্ষেপ

১ম ওয়াহিদুজ্জামান মণ্ডল

২য় অসীম কুমার চৌধুরী

৩য় বিশ্বজিৎ বাগচী

✪ দিবা বিভাগ ছাত্রী

১০০ মিঃ দৌড়

১ম তন্দ্রা দালাল

৩য় মিনতি ঘোষ

২০০ মিঃ দৌড়

১ম তন্দ্রা দালাল

২য় মিনতি ঘোষ

৩য় সাধনা খাঁ

১৫০০ মিঃ ভ্রমণ

১ম শিপ্রা বণিক

২য় সাধনা খাঁ

৩য় সীমা সাঁতরা

✪ দীর্ঘ লম্ফন

১ম সাধনা খাঁ

২য় তন্দ্রা দালাল

৩য় কৃষ্ণা গাঙ্গুলী

✪ লৌহবল নিক্ষেপ

১ম পরেশ চন্দ্র প্রামাণিক

২য় স্বরূপ ভট্টাচার্য

৩য় পার্থ চ্যাটার্জী

✪ বর্শা নিক্ষেপ

১ম দেবাশীষ হালদার

২য় মানিক সরকার

লৌহবল নিক্ষেপ

৩য় অসীম কুমার চৌধুরী

✪ বর্শা নিক্ষেপ

১ম জয়ন্ত গোস্বামী

২য় প্রতুল কুমার দাস

৩য় শুভ্র মুখার্জী

✪ দীর্ঘ লম্ফন

১ম সাধনা খাঁ

২য় তন্দ্রা দালাল

৩য় কৃষ্ণা গাঙ্গুলী

✪ ক্রিকেট বল নিক্ষেপ

১ম শিখা কর

২য় নমিতা খাঁ

৩য় মীরা দত্ত

✪ লৌহবল নিক্ষেপ

১ম মুক্তিশ্রী কর্মকার

২য় মীরা দত্ত

৩য় কবিতা মুখার্জী

✪ প্রাতঃ বিভাগ (ছাত্র)

১০০ মিটার দৌড়

১ম পার্থ প্রতিম কর

২য় অশোক ভট্টাচার্য

৩য় স্বপন নন্দী

২০০ মিঃ দৌড়

১ম ইনসান আলী

২য় পার্থ প্রতিম কর

৩য় মানস নন্দী

৮০০ মিঃ দৌড়

১ম প্রদীপ কুমার বণিক

১ম বেবী বসাক
২য় অপর্ণা পাল
৩য় অঞ্জলী পাল

● দীর্ঘ লম্ফ
১ম অপর্ণা পাল
২য় বেবী বসাক
৩য় অঞ্জলী পাল

৩য় পার্থ চ্যাটার্জী

প্রাতঃ বিভাগ ছাত্রী

২০০ মিঃ
১ম বেবী বসাক
২য় অপর্ণা পাল
৩য় অঞ্জলী পাল

● লৌহ বল নিক্ষেপ
১ম বেবী বসাক
২য় অপর্ণা পাল
৩য় অঞ্জলী পাল

২য় মানস নন্দী
৩য় ইনসান আলী

● উচ্চ লম্ফ
১ম পার্থ চ্যাটার্জী
২য় তারকনাথ চৌধুরী
৩য় ইনসান আলী

● ডিসকাস নিক্ষেপ
১ম বেবী বসাক
২য় অপর্ণা পাল
৩য় উমা বাগচী

৪×১০০ মিঃ রিলে দৌড়, দিবা ছাত্র
১ম ১১শ শ্রেণী
২য় ২য় বর্ষ সাহিত্য

৪×১০০ মিঃ রিলে দৌড় প্রাতঃ ছাত্র
১ম ১ম বর্ষ বাণিজ্য
২য় ২য় বর্ষ বাণিজ্য

ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন

দিবা ছাত্র— অমরেন্দ্র কুণ্ডু, অর্জিত পয়েন্ট ১৫
দিবা ছাত্রী— শিখা কর .. ২৫
প্রাতঃ ছাত্র— ইনসান আলী .. ১৮
প্রাতঃ ছাত্রী— বেবী বসাক .. ২৩

ক্রীড়া সম্পাদক (দিবা)
১। শিখা কর
২। অরূপ কুমার গোস্বামী
৩। ইন্দ্রজিৎ গাঙ্গুলী

ক্রীড়া সম্পাদক (প্রাতঃ)
১। ইনসান আলী
২। পার্থ চ্যাটার্জী

ইনডোর ক্রীড়া সম্পাদক (প্রাতঃ)
১। অভিজিৎ মল্লিক

সহঃ ক্রীড়া সম্পাদক (দিবা)
১। বিদ্যুৎ দাস
২। জাহাঙ্গীর হোসেন

সহঃ ক্রীড়া সম্পাদক (প্রাতঃ)
১। মিলন কুমার দত্ত

ইনডোর ক্রীড়া সম্পাদক (দিবা)
১। অমিতাভ দাস
২। সাহাবুদ্দিন মণ্ডল
৩। সত্যশরণ সেন
৪। শুক্লা দত্ত

সংস্কৃতি সংবাদ

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিবারের ন্যায় বিগত বছরও [illegible] জানুয়ারী ২০০৫ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন [illegible] সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন ছাত্র সংসদের সভাপতি ও আমাদের কলেজের অধ্য[illegible] ড. [illegible]। সভাপতি তাঁর ভাষণে [illegible] ছাত্র-ছাত্রীদের [illegible] করার জন্য [illegible] প্রয়োজন। [illegible] ছাত্র-ছাত্রীদের [illegible] সুকুমার প্রবৃত্তির [illegible] হবে বলে [illegible]।

গত [illegible] জুলাই [illegible] ছাত্র সংসদের [illegible] পত্রিকা "[illegible]" [illegible] করেন বাংলা বিভাগের প্রধান ড. [illegible] মুখোপাধ্যায়।

'আন্তঃকলেজ যুব উৎসব' উপলক্ষে [illegible] ছাত্র সংসদের [illegible] প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে [illegible] সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আমাদের কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও [illegible] সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও [illegible] ছিলেন ড. [illegible] চৌধুরী ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

আন্তঃকলেজ যুব উৎসবে বিভিন্ন বিষয় প্রতিযোগিতার ফল নীচে দেওয়া হল।—

'আবৃত্তি : বিভাগ 'ক'
১ম রিঙ্কু বিশ্বাস
২য় সুব্রত মিত্র

ঐ : বিভাগ 'খ'
১ম মনোজিৎ ঠাকুর
২য় পার্থসারথি ভট্টাচার্য

ঐ : বিভাগ 'গ'
১ম নাতাশা নাসকর
২য় দেবাশীষ ভৌমিক

'সঙ্গীত : বিভাগ 'ক'
১ম মালবিকা ঠাকুর
২য় মধুমিতা গোস্বামী

ঐ : বিভাগ 'খ'
১ম সোমা ঠাকুর
২য় সম্পা সাহা

বিতর্ক বিভাগ 'ক'
১ম অর্পিতা দে
২য় বিশ্বজিৎ দাস

ঐ : বিভাগ 'খ'
১ম নাতাশা নাসকর
২য় শান্তনু চক্রবর্তী।

সম্পাদক

সাংস্কৃতিক সম্পাদক (দিবাঃ)

১। জ্যোতিষ্মান মণ্ডল
২। অনিমেষ কুণ্ডু
৩। পীযূষ মুখার্জী
৪। কল্যাণ চক্রবর্ত্তী
৫। শৈবাল দাস

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

১। সুবীর দে
২। অনিল দেবনাথ
৩। সোমা ইন্দ্র
৪। সুমন চ্যাটার্জ্জী

সাংস্কৃতিক সম্পাদক (প্রাতঃ)

১। দেবকান্তি ঘোষ
২। তপন লাহা
৩। জয়দীপ গুপ্ত

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক (প্রাতঃ)

১। রমাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
২। সমীর দেবনাথ

"পরাজয়"

শ্রীউজ্জ্বল কুমার দত্ত
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ, ক্রমিক নং—৩৪

হা! হা! হা! অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে কিষাণলাল। বীভৎস হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে "যি যে তুই বলিস সুখলাল, তার ঠিক নেই। চন্দোর করবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! অনেক হয়েছে, কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললোনা ওকে।"

"তুমি বিশ্বাস করো সর্দার, সে সবকথা পুলিশকে বলে দিয়েছে। আজকে ওর সাজা পড়েছিল, সে তো তুমি জান। পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরেছে। ছ'মাস পরে জামিনে খালাস পাবে। কি হবে সর্দার! শিগগীরই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।"

"সুখলাল, তুই তো জানিস, আমার মৃত্যু আমার কাছে। বুড়ো হয়েছি মাথায় বেরুবার শক্তি পর্যন্ত নেই, তোদের রোজগারে খাচ্ছি। ও যে এরকম দুর্বল হতে পারে এত কল্পনা করতেও—না, না, না, সে কখনও দলের নাম বলবে না। তুই জানিস না সুখলাল, তখন ও [illegible]। ফুটপাথের উপর শুয়ে কাঁদছিল। খালি হাতে ফিরছি, এমন সময় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি। সেই থেকে ও আমার কাছে আছে। আস্তে আস্তে ওকে ছুরি কাঁটি ধরতে শিখিয়েছি। ভদ্রলোকের ছেলে ছিল, কালে দুরবস্থায় পড়ে ওর এই হলো। কিন্তু আস্তে আস্তে ও বেশ পাকা পোক্ত হয়ে উঠেছিলো শুধু সব্যবসায়ের জোরে। জানিস সুখলাল, ওকে আমি নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতাম। ভেবেছিলাম, বুড়ো হয়েছি, ওকে সর্দার করে দিয়ে যাব। ওকি কখনও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? তুই শুয়ে পড় সুখলাল, তোর আজ বেড়িয়ে কাজ নেই।"

নিশুতি রাত। এমন সময় কার চাপা কণ্ঠস্বরে সর্দারের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, "সুখলাল, দেখ্, দেখ্, সর্দার বলে কে যেন ডাকছে। ভোজালিটা সঙ্গে নিয়ে দরজাটা খুলে দে।" সুখলাল নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে দেখে অন্ধকারে ভূতের মত সামনে দাঁড়িয়ে চন্দোর। সারা গায়ে রক্ত মাখা। সুখলালের মুখটা চেপে ধরে বলে, "চুপ! চেঁচাস না।" তারপর নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকে। "কে! কে ওখানে সুখলাল?" অন্ধকারে হাতড়িয়ে টর্চ জ্বালে সর্দার। চমকে উঠে বলে তুই! চন্দোর তুই এখানে কি করে এলি? "আমি—আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি সর্দার, আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি, ভেবেছিলাম, মুক্তি পাব। কিন্তু তবুও ওরা আমাকে আটকে রাখল। জেলের পাঁচিল টপকে দারোয়ানকে খুন করে আমি পালিয়েছি। তুমি আমায় শাস্তি দাও সর্দার, বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি। করার অপরাধে হয়ত দুদিন বাদে আমার ফাঁসি হবে। তখন...... তখন যে আমি মরেও শান্তি পাব না সর্দার।

অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে শঙ্কর। মুখ দিয়ে কথা সরে না তার। [illegible] দুঃখময় জীবনে অনেক পাপ করেছি, অনেকবার জেল খেটেছি। কিন্তু এমন [illegible] দেখিনি। এমন সত্যিকার মানুষও দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন দুটো চোখ খুলে গেছে। [illegible] আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলি। তোকে আমি শাস্তি দেব? কিন্তু আজ তুই [illegible] এর চেয়ে বড় শাস্তি আমার জানা নেই। আজ — সেই [illegible]। ঃ—একটু ও — না, ও — না, আজ— !"

[illegible] শঙ্কর। [illegible] দরজা খুলে দিল।

"শঙ্কর! শঙ্কর!" [illegible]। কিন্তু এ [illegible] খেলা। [illegible] সেটা সেটা হল।

নিম্ন তাপমাত্রা বিজ্ঞান এবং এর কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ

—ডঃ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্ন তাপমাত্রা [illegible] আমাদের [illegible] কথা মনে হয়। [illegible] আমরা [illegible] ব্যবহার করে থাকি। [illegible] নিম্ন তাপমাত্রায় পৌঁছানো [illegible] তাপমাত্রা [illegible] নিম্ন তাপমাত্রা [illegible] তাপমাত্রায় পৌঁছানো [illegible] বিজ্ঞানে [illegible]। নিম্ন তাপমাত্রা [illegible] জানা যাবে।

শীতলীকরণের অনেক পদ্ধতি আছে যার মুখ্য কয়েকটার কথা আমরা বলবো। বরফের তাপমাত্রা শুন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা পরমশুন্য তাপমাত্রার চেয়ে 273·14° বেশী (0°K = −273 14°C)। যদি 77·6 গ্রাম বরফের সাথে 22·4 গ্রাম সাধারণ লবন মেশানো হয় তবে তাপমাত্রা কমে হয় −21·2°C। অন্যান্য পদার্থ বরফে মিশিয়ে তাপমাত্রা আরো কমানো সম্ভব হয়েছে! সবচেয়ে নীচু যে তাপমাত্রায় এভাবে নামা গেছে তা হোলো 68·5 গ্রাম বরফে 31·5 গ্রাম পটাসিয়ম হাইড্রক্সাইড মিশিয়ে ; লব্ধ তাপমাত্রা −65°C। এ ধরণের মিশ্রণের নাম হিমমিশ্রন।

বাষ্পায়ণে ঠাণ্ডার উৎপত্তি হয় এটা আমাদের সকলেরই জানা। যদি হাতে কোনো উদ্বায়ী পদার্থ (যেমন ইথার ঢালি) বা গরমের দিনে পাখার বাতাস করি তবে ঠাণ্ডা লাগে। এটার কারণ উদ্বায়ী পদার্থ বা শরীরের ঘাম বাষ্পীভূত হওয়া এবং শরীর থেকে প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করার জন্য। যদি কম চাপে কোনো তরল পদার্থকে বাষ্পীভূত করা হয় তবে তরল বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ তরল থেকেই জোগাড় করে নেবে। ফলে তরল ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। এইভাবে তরল অ্যামোনিয়া, ফ্রিয়ন ইত্যাদিকে বাষ্পীভূত করে শৈত্যের সৃষ্টি করা যায়। শীতলতা সৃষ্টি করার আরেকটা প্রধান পদ্ধতি হোলো উচ্চচাপে রাখা গ্যাসকে খুব সরু ছিদ্র দিয়ে প্রসারিত করে একটা বড়ো জায়গায় ছেড়ে দেওয়া। প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে গ্যাসের অণুগুলি দূরে সরে যাবে এবং এজন্য গ্যাসকে প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। কিন্তু কাজ করার সামর্থ বা শক্তি গ্যাস পাবে কোথেকে? এই শক্তি গ্যাস নিজের কাছ থেকেই জোগাড় করে নেবে ; ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা কমে যাবে। ক্রমাগত এই পদ্ধতি বারবার অনুসরণ করলে গ্যাসটি ঠাণ্ডা হয়ে এর অন্তর আণবিক ফাঁক কমে গিয়ে গ্যাসটি তরলে পরিণত হবে যার স্ফুটনাঙ্ক বরফের তাপমাত্রা (0°C) এর অনেক নীচে। এভাবে শীতলীকরণের সময় অবশ্য কতগুলি সর্ত মেনে চলা প্রয়োজন। তরল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে −182·95°C, −252·76°C এবং −268·83°C। পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা পি জুল এবং জে জে থমসন।

বিজ্ঞানীদের অভিযান এখানেই থেমে যায়নি। তাপরুদ্ধ বিচুম্বকন ক্রিয়ার সাহায্যে যে তাপমাত্রায় পৌঁছান গেছে তার মান 0·0014°K (−273·14 C = 0°K)। কেন্দ্রকের তাপরুদ্ধ বিচুম্বকন করে O. V. Lounas maa নামক একজন পদার্থ বিজ্ঞানী সম্প্রতি যে নিম্ন তাপমাত্রায় পৌঁছেছেন তার মান 10^{-9}°K অর্থাৎ পরমশুণ্য তাপমাত্রার স্কেলে এক এর একশো কোটি ভাগের এক ভাগ তাপমাত্রা। পদ্ধতিটার নীতিটা এই রকম। যদি কোনো চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকিত করা হয়, তবে তাপের উদ্ভব হবে। এখন বাইরে থেকে যদি তরল হিলিয়ম বা এই জাতীয় হিমায়ক দিয়ে উদ্ভূত তাপ অপসারিত করা হয় এবং তারপর পদার্থটির চুম্বকত্ব বিনষ্ট করা হয় তবে আবার তাপ শোষিত হবে। তবে

পদার্থ ঐ তাপ নিজের চারপাশ থেকেই গ্রহণ করে ঐ অঞ্চলের তাপমাত্রা অনেক কমিয়ে দেবে। তাহলে প্রশ্ন হোলো আমরা কি পরমশুন্যে পৌছুতে পারবো ? না ! তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে এই পরম শুন্যকে কোনো দিনই ধরা যাবে না।

নিম্ন তাপমাত্রা, বিজ্ঞানের প্রায় এমন একটা শাখাও নেই – যেখানে ব্যবহার করা হয়নি। আমরা শুধু এর কয়েকটা ব্যবহারিক প্রয়োগের কথাই আলোচনা করি।

ক) পদার্থ বিজ্ঞানে প্রয়োগ।

পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিম্ন তাপমাত্রা বিজ্ঞান এক অপরিহার্য সম্পদ। এমনকি নিম্ন তাপমাত্রা পদার্থ বিজ্ঞান নামে পদার্থ বিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখার জন্ম হয়েছে। কেলাসিত কঠিন পদার্থের বিভিন্ন ভৌতগুণাবলীর মৌলিক গবেষণায় এর প্রয়োগ হয়েছে। পদার্থের চুম্বকধর্ম, পরিবাহীতা, সান্দ্রতা, দৃঢ়তা ইত্যাদির নিম্নতাপমাত্রায় ব্যবহার বেশ চমকপ্রদ। এইভাবেই আবিষ্কার হয়েছে অতি পরিবাহীতা এবং অতি প্রবাহমানতার। অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের তড়িৎপ্রবাহের পথে বাধার মান শুন্য হয়ে পড়ে তখন প্রবাহ একবার পাঠালে তা পরিবাহীর মধ্যে হয়ে থাকে চিরস্থায়ী – এই ধর্মের নাম অতি পরিবাহীতা। এই অতি পরিবাহীতার প্রয়োগে কম শক্তির ব্যয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বক তৈরী করা গেছে যার সৃষ্ট চুম্বকক্ষেত্র 50 কিলো গাউস। জীবনযাত্রার প্রযুক্তিতে অপরিহার্য আধুনিক গণকের (Computer) স্মৃতিরক্ষার যে সুইচ (memory switch) তাও এই অতি পরিবাহীতার প্রয়োগের ফলে তৈরী হয়েছে। এই সুইচগুলোর দ্রুতগতিতে কাজ করার ক্ষমতা, স্বল্পব্যয় এবং ছোটো আকার প্রযুক্তিতে যুগান্তর এনেছে। নিম্ন তাপমাত্রায় লেসার ও মেসার ক্রিয়া আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এছাড়া প্লাজমা পদার্থ বিজ্ঞান, পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় এব অগনিত অনেক মৌলিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় নিম্ন তাপমাত্রা বিজ্ঞান বিপ্লব এনেছে।

খ) মহাকাশ বিজ্ঞানে প্রয়োগ।

মহাকাশে যে রকেট পাঠানো হচ্ছে তার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় তরল হাইড্রোজেন যার খরচ কম এবং সুবিধা অন্য কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা অনেক বেশী। এছাড়া মহাকাশে যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ এবং বস্তুর ধর্ম সম্পর্কে গবেষণায় এই শাখার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

গ) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োগ।

দেখা গেছে প্রাণীকোষ উচ্চতাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। 50°C তাপমাত্রায় সাধারণতঃ প্রাণীকোষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অনেক নিম্ন তাপমাত্রা পর্যন্ত প্রাণীকোষ সজীব থাকে ! –150°C

থেকে −190°C এর মধ্যে গো-মহিষাদির ডিম্বকোষ সংরক্ষণ করে বিভিন্ন জায়গা থে এনে উন্নততর গো-মহিষাদির চাষ সম্ভব হয়েছে। মাছ চাষের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ আছে

এছাড়া রক্তকে বিশেষভাবে নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে রাখলে বহুদিন কোষগুলিকে বাঁচিয়ে র সম্ভব ; ফলে ব্লাডব্যাঙ্কের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় এই বিজ্ঞ এর প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসালয়ে উপযোগী বন্ধু জীবাণু নিম্ন তাপমাত্রায় সংর করে বহুদিন জীবিত রাখা হয়। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্রের শল্য চিকিৎসালয়, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের জীবা প্রকৃতি বিশ্লেষণে এবং অন্য অনেক অগনিত কাজে এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাণীর এমনকি মানবদেহকে নিম্ন তাপমাত্রায় মমি করে রেখে এর পর হয়তো মৃত্যুকে বেশ কয়েকশো ব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এই বিজ্ঞানের প্রয়োগে অনেক কল্পনাহীন বাস্তবে পরিণত হয়েছে ত ভবিষ্যতে এ কল্পনাও বাস্তবে রূপ নেবে কিনা কে বলতে পারে!

এ সম্বন্ধে আরো বিশদ জানতে হলে নিম্নলিখিত বইগুলো পড়া দরকার—

1) Heat and Thermodynamics : M. N. Saha & B. N. Srivastava, Indian Press Pvt. Ltd., Allahabad, 1931.

2) Properties of materials at low temperatures : R. L. Powell, Pergamon Press, Oxford, 1961.

3) Experimental Principles and methods below 1 K, O. V. Lounasmaa Academic Press, 1974.

4) Freezing eggs and embryos of From Analysis, C. Polge Cryobiology, 1977,

"আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা ও তার প্রতিকার"

[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible])

[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] — "Prevention is better than cure." অর্থাৎ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] (Teamspirit) এর অভাব। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করতে পারবে।

ক্রিকেটে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ সিংহাসনে আসীন। ভারতের হাতে গতটি আন্তর্জাতিক প্রতি-যোগিতার পুরস্কার [বিশ্বকাপ '৮৩, রথম্যানস কাপ, এশিয়ান কাপ এবং বেনসন এণ্ড হেজেস কাপ]। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সুখের পর দুঃখের মতই সাফল্যের পর ব্যর্থতা আবর্তিত হয়। তাই ... চমকপ্রদ বিশ্বকাপ জয়ের পর নিজের দেশের মাটিতে ভারতীয় দল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কেন এই পরাজয়? দল নির্বাচনে দলাদলি, দেশের মাটিতে হওয়ার জন্য প্রায় খেলায় খেলোয়াড় পরিবর্তন, সিনিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে মনোমালিন্য ও সর্বোপরি দলগত সংহতির অভাবই এই পরাজয়ের সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত মিনি বিশ্বকাপের খেলায় ভারত প্রমাণ করেছে জয়ের জন্য দরকার দলীয় সংহতি। এটা ভারতের ক্রিকেটের মঙ্গলচিহ্ন। এই প্রতিযোগিতায় ভারত পেয়েছে আজাহারউদ্দিন, শিবরাম কৃষ্ণান, সদানন্দ বিশ্বনাথ, শ্রীকান্তের মত খেলোয়াড়দের। অপর দিকে প্রবীণ গাভাসকর, মহিন্দর, মদনলাল, বিনি প্রমাণ করেছে প্রবীণ হলেও ভারতীয় দলের জয়ে তাদের ভূমিকা কম নয়। ক্রিকেট জগতে ভারত সূর্যের মত থাকুক এটাই ভারতবাসীর কাম্য।

গত ২৩তম অলিম্পিক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিরা অ্যাথলেটিকসে ব্যর্থ হয়েছে। পি. টি. উষা, আব্রাহাম প্রভৃতির মত অ্যাথেলিটদের ব্যর্থতা আমাদের সাফল্য সম্পর্কে ভাববার অবকাশ করে দেয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার অভাব আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণের অভাব, ভালো জিমন্যাসিয়ামের অভাব-ই আমাদের ব্যর্থ হবার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম।

হকি, ক্রিকেট, অ্যাথেলিটিকসের পর আলোচনায় আসি ফুটবলের প্রসঙ্গ নিয়ে।

ফুটবলে ভারতে খেলার মান আন্তর্জাতিক মানের অনেক নীচে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত খেলায় ভারত যে ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তা সত্যি লজ্জাজনক। কিন্তু কেন এই বিস্ময় পরিণতি??

বিশ্বের অনেক ছোট ছোট দেশ বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নিলেও আমাদের মত বিশাল দেশ কেন অংশ নিতে পারে না তা আমাদের ভাববার অবকাশ করে দিয়েছে।

ভারতে প্রচলিত খেলাগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হল ফুটবল। সচেতন ক্রীড়া প্রেমিকদের অনেকে উত্তর দেবেন এই হালের জন্য দায়ী এক শ্রেণীর মেকী ফুটবল কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের একাংশ। যারা দেশের ফুটবলের ধারক, বাহক ও প্রচারক তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নেই কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার অভিজ্ঞতায়, খেলোয়াড় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা, তাদের এই অজ্ঞতা নষ্ট করে দিচ্ছে আগামী দিনের কিছু খেলোয়াড়কে। ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দেয় পশ্চিমবাংলা তথা কলকাতার খেলোয়াড়রা। কলকাতার তিন প্রধানের কর্মকর্তারা তথাকথিত সুপারস্টারদের জন্য ব্যয় করছে লাখ লাখ টাকা। এই পেশাদারী মনোভাব খেলার মানসিকতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে এই মেকী ক্লাব কর্মকর্তারাই ভারতীয় ফুটবলের ধ্বংসের প্রধান স্থপতি। জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক মানের অভাবই

ভারতীয় ফুটবলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রোগীর রোগ সারাবার জন্য যেমন ওষুধ দরকার তেমনি ভারতীয় ফুটবলের মানোন্নয়নের জন্য দরকার আন্তর্জাতিক মানের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব থাকা উচিত আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিজ্ঞ দুই বা ততোধিক প্রাক্তন খেলোয়াড়কে নিয়ে গড়া প্রশিক্ষকমণ্ডলীর উপর। তরুণ খেলোয়াড়দের বেশী সংখ্যায় প্রশিক্ষণ শিবিরে এনে তাদের ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করা দরকার। ভারতে আন্তর্জাতিক মানের মাঠের সংখ্যা কম। এই মাঠের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়। অন্ধকার সরে আশার আলো উঁকি দেবে ভারতীয় ফুটবলে। খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও ক্রীড়া প্রেমিক, দেশবাসীর সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে ভারতীয় ফুটবল আন্তর্জাতিক আসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। বর্তমান অনুচ্ছেদে ব্যর্থতা প্রতিকারের জন্য কতগুলি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলাম। সচেতন ক্রীড়াপ্রেমিকের সঙ্গে প্রতিকারের উপায়গুলি নিয়ে মতের মিল হতে পারে।

উপায়গুলি—

১) জাতীয় ক্রীড়ানীতি চালু করা।

২) ক্রীড়াখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের আরো বেশী অর্থ ব্যয় করা।

৩) নতুন প্রতিভাদের সন্ধানের জন্য অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ নির্বাচক নিয়োগ করা।

৪) স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা ও সারা বৎসর প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা।

৫) জাতীয় দল বা প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের চাকরীর ব্যবস্থা করা।

৬) একই সময়ে অত্যাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন খেলোয়াড় হলে একাধিক দল গঠন করে বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় পাঠানো দরকার।

৭) দেশের টুর্নামেন্টগুলিতে বিদেশের আন্তর্জাতিক মানের দল আনা।

৮) অনুশীলনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ষ্টেডিয়াম ও জিম্‌ন্যাসিয়াম তৈরী করা দরকার।

৯) খেলাধুলার মাধ্যমে দেশবাসীর সংহতি অটুট রাখা দরকার।

ব্যর্থতার কালো পাথর ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে বেশীদিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাই আসুন আন্তর্জাতিক যুববর্ষে কোটি কোটি ভারতবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবির ভাষায় বলি—

"ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

ইলেকশন

শ্রীভবানীপ্রসাদ প্রামানিক
বি-এস-সি, প্রথম বর্ষ, রোল নং ৩১

কেষ্টপুর পৌরসভার নির্বাচনে রবীবাবু ও শশিবাবু দুজনে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে দুজনেই দুইদলের নেতা। দুই দলের অন্যান্য আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। রবিবাবুর ভাল নাম রবীন্দ্র বাগ এবং বয়স ষাট। শশিবাবুর নাম শশিভূষণ সিংহ, বয়স তিন কুড়ি ছয়। এই রবীবাবু চাঁদপুর খাঃ উকিল ছিলেন। শশিবাবু ঠিকাদারি করে প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছেন। এই রবীবাবু এবং শশি নির্দল প্রার্থী নন। তারা দুজনেই দুই সাইডের পাণ্ডা। রবীবাবুর দলের প্রতীক ঘোড়া এবং শশিবা দলের প্রতীক বলদ। দুই পক্ষেই প্রচুর ছেলে-ছোকড়া জুটে গিয়েছে। কেষ্টপুর গ্রামে তিনটি হাই স্কু এবং একটি কলেজ, কাজেই প্রচুর বেকার ছেলের অভাব নেই।

দুই পক্ষা থেকেই জোর প্রচার চলেছে। ১৮ বছর পর কেষ্টপুরে পৌরসভার নির্বাচন হচ্ছে যাদের বয়স পঁচিশ তাদের শেষ নির্বাচনের কথা স্মরণে নেই। তারা তখন খুব ছোট ছিল। তাদে বাবা মা বলাবলি করে এখনও, ভোট হয়েছিল বটে সেবার। একদিকে গাঁয়ের জমিদারদের বড় ছেলে জগাবাবু অন্যদিকে স্কুল মাষ্টার কিশোরীবাবু। জমিদারী চলে গেলেও তখনও পর্য্যন্ত জমিদারদের নাম ছিল। জগাবাবু চারটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কিশোরীবাবুর ঘোড়ার গাড়ী নেই তাই রিক্ করে এসেছেন। বিপুল ভোটে জিতল জগাবাবু। তারপর ১৮ বছর পরে এই ইলেকশন। কেষ্টপু ভোট জমে উঠেছে। এমন সময় দেবীদের আবির্ভাব। স্বর্গের দেবদেবীরা- সাধারণতঃ মর্ত্যের ব্যাপার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। বিশেষ করে কুটনীতি বা রাজনীতি ব্যাপারে তো নয়ই। সেই সময় সরস্বতী এবং লক্ষ্মীর কি একটা ব্যাপারে তুমুল ঝগড়া বাধে। দুই বোনে যেমন গলাগলি ভাব তেমন মার ঝগড়াও। যখন ঝগড়া চলে তখন তুলকালাম কাণ্ড হয়, এবারও তাই হল।

সরস্বতী বলল টাকা থাকলেই হয় না, কালচার চাই বুঝলি!

লক্ষ্মী বলল, আরে রাখ রাখ তোর কালচার, কালচার নিয়ে কি ধুয়ে খাবি। টাকার কাছে তোর বিদ্যে বলিস আর কালচার বলিস সব তুচ্ছ।

সরস্বতী বলল, মুখেতো খুব লম্বা চওড়া কথা বলিস, আরে যা যা, তোর মরদ আমার জানা আছে।

—তোর মরদও আমার বোঝা আছে। দেখবী কি করতে পারি? তুই দেখবি আমি কি করতে পারি?

ঝগড়া করতে করতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুজনে অজান্তে কেষ্টপুরে নেমে এসেছিল। এরা দেবী বলে সাধারণ মানুষ এদের দেখতে পায়নি। সেই সময় দেখা গেল একটি মিছিল এগিয়ে আসছে। মিছিলের সামনে একটা মোটা সোটা লোক রয়েছে, পিছনে একগাদা ছেলে-ছোকরা তারা স্লোগান দিচ্ছে। ভোট কর

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছে সবাই—রবীদা।

তারপর মাইকে পথসভা। এক প্যান্টলুন পড়া ছোকড়া মাইকে বলতে লাগল—

বন্ধুগণ, এবারে আপনাদের পরিচিত পৌরসভায় ভোটপ্রার্থী রবীদা। রবীদার পরিচয় নূতন করে দেবার কিছু নেই, আমরা শুধু বলতে চাই গত ১৮ বছর ধরে কেষ্টপুরের হাল এমন করল কে? গ্রামে দুর্নীতি ঢোকাল কে? আপনাদের ট্যাক্স বেড়েছে, রাস্তা-ঘাট মেরামত হয়নি। অথচ নিজেদের দলের ছেলেকে চাকরী দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আপনারা গর্জে উঠুন। গর্জে উঠে আপনারা রবীবাবুকে নির্বা-করে কেষ্টপুরের উন্নয়নে সাহায্য করুন। —জনতা হাততালি দিয়ে বক্তাকে অভিনন্দন জানান।

সরস্বতী রবীবাবুকে দেখিয়ে বলল, দ্যাখ এই যে রবীবাবু এর পেটে বিদ্যে আছে। একজিতি করে সাক্সেস্ফুল হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছেন বলেই ভাল উকিল। তাই তার ভাল পসার। ভোটে ওকে আমি জেতাব।

লক্ষ্মী কিছু না বলে শুনে গেল, মনে মনে ভাবছে দেখি কত ধানে কত চাল। একটু এগিয়ে যেতেই দেখে আর এক দল মিছিল নিয়ে এগিয়ে আসছে। মিছিলে ধ্বনি উঠছে—শশিবাবু জিন্দাবাদ! ভোট দেবেন কাকে?—শশিবাবুকে। এখানে পথসভা হল, পথসভায় একজন প্যান্টুল পরা ছোকরা বক্তৃতা দিতে লাগল। ভাইসব, বিপ্লব আসতে আর দেরি নেই, তাই ভোট আপনারা শশিবাবুকে দেবেন। এই কেষ্টপুর পৌরসভার গত ১৮ বছর ধরে উনি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ছিলেন। গ্রামের কাজ করবার জন্য ওনার ব্যবসায় কত ক্ষতি হয়েছে, ব্যবসায় উনি সময় দিতে পারেননি। ছেলেদের হাতে ব্যবসা দিয়ে উনি গ্রামের কাজ করেন। আজ উনার জন্যই গ্রামে পানীয় জল এসেছে, উনার জন্যই একশত বেকার ছেলে চাকরী পেয়েছে। এই শশিবাবু জনগণ বলতে প্রাণ। ভোট কর—শশিবাবু। লক্ষ্মী শশিবাবুকে দেখিয়ে বলল, এই যে শশিবাবু ক্লাস ফোর বিদ্যে! কিন্তু ঠিকাদারি করে লাখ লাখ টাকা করেছে। বিদ্যেটা যে কিছুই নয় এটা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। এই বিদ্যে নিয়ে কেষ্টপুর পৌরসভায় ১৮ বছর অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর করল। সবাই শশিবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসলে চাঁদির জুতা মারলে সবার মুখ বন্ধ করা যায়। বড়বড় মস্তানরাও লেজ গুটিয়ে পালায়। আমি এই ইলেকশনে শশিবাবুকে জিতাবই। দেখি তোর কি সাধ্য তাকে হারাস।

লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুইজনেই এরপর ফন্দি আঁটল যে কি করে তার নিজ নিজ ক্যান্ডিডেটদের কিভাবে জেতান যায় আর বিরোধীকে কিভাবে হারানো যায়। সরস্বতী ঠিক করল যে দুষ্ট সরস্বতী হয়ে শশিবাবুর দেহে ভর করবে, এবার লক্ষ্মী ঠিক করল যে অলক্ষ্মী হয়ে রবীবাবুর সংসার নষ্ট করবে। তার ইজ্জৎ ধুলোয় লুটিয়ে দেবে। ঠিক তাই হল। এবার দেখা গেল রবীবাবু তিনি নানা আবোল-তাবোল কাজ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে রবীবাবু একটু ওইসকি খেয়ে নিতেন তারপর আদালতের কাগজ পত্র নিয়ে বসতেন। মদ্যপানের পর মুখে একটুকরা রসুন ফেলে দিতেন। রসুনের গন্ধে মালের গন্ধ বেরোত না, অলক্ষ্মী রবীবাবুর দেহে ভর করার পর তিনি মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, এমনকি দিনে দুপুরে তিনি মাল খেতেন, তার বন্ধু ও প্রচুর জুটে গেল। একদিন গ্রামবাসীদের কাছে বক্তৃতায় মালের ঝোঁকে তিনি বলে ফেললেন কেষ্টপুর একটা মরা খাল। সেই মরা খালে আমি জোয়ার এনে দিতে চাই কিন্তু মালের নেশায় খালের বদলে গ্রাম বললেন—ব্যাস! আর কি—গ্রামের লোকেরা শুনলো—মরা গ্রাম—আর কোথায় যায়—জনতা খেপে গেল। কি! কেষ্টপুর মরা গ্রাম! হতে পারে এখানে বর্ষায় প্যাচপেচে কাদা, দিনে মাছি, রাতে মশা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। কিন্তু এই গ্রাম দিয়ে চৈতন্যদেব হেঁটে গিয়ে ছিলেন। রামকৃষ্ণ প্রথম জীবনে তামাক খেয়েছিলেন এই গ্রামে বসে। বিখ্যাত কবি হট্টোগোলের বাড়ী এখানে। এই গ্রামে স্বাধীনতার আগে পুকুরের জল থেকে লবন তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল। আর সেই গ্রামকে বলে মরা কেষ্টপুর! ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে জনতা খেপে গেল এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা গুঞ্জন চলতে থাকল, শশিবাবুর দল সংগে সংগে এটাকে ক্যাচ করল, তারা বলল—দেখুন ভাইসব, এই ঐতিহ্য গ্রামকে রবীবাবু বলে কিনা মরা গ্রাম, ওনার এতবড় সাহস, কিন্তু এই কেষ্টপুর যদি মরা হয় তবে এই গ্রামকে মারল কে?—রবীবাবুর মতন কিছু বড়লোক এরা সমাজের পরগাছা। রবীবাবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত। মালের ঝোঁকে কি বলে ফেলেছেন তা তার মনে নেই। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর তার মনে হল হ্যাঁ বলে ছিলাম বটে মরা খাল, মরা গ্রাম তো বলিনি। কেউ কেউ বলল রবীবাবুকে কালো পতাকা দেখানো হোক। যেখানে রবীবাবু সেখানেই কালো পতাকা। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়ল—রবীবাবু মুর্দাবাদ। যতই হোক রবীবাবু শুধু শিক্ষিতই নয় নাম করা উকিল। তাই তিনি একটা বিবৃতি দিলেন—আমি কখনই বলিনি যে আমার গ্রাম মরা গ্রাম। কেন বলব! আমাদের গ্রাম প্রাণ শক্তিতে টগবগ করে ফুটছে। কালচার যেন কদম ফুলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। গ্রামের মানুষের পেটে ভাত না থাক তাদের কালচার আছে "কেষ্টপুর ইজ এ নট অনলি অ্যাগ্রিকালচার ভিলেজ বাট অলসো এ কালচার ভিলেজ অব ইণ্ডিয়া।" কিন্তু যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। কিছুতেই লোকের মন ভিজল না। রবিবাবুর নির্বাচনের ফলাফল যে কি ভয়াবহ হবে সে কথা সবাই ভাবতে লাগল। রবিবাবু বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে লাগলেন আমি মরা গ্রাম বলিনি আপনারা বিশ্বাস

করুন, কিন্তু কে শোনে তার কথা। স্বর্গে লক্ষ্মীর মনে আনন্দের সীমা আর ধরে না। সে সরস্বতীকে বলল, নে এবার ঠেলা সামলা, বিত্তের জোরে তোর রবিবাবুকে আর বেশী দিন করে খেতে হবে না। আমি শেষ করে দিয়েছি।

সরস্বতী বলল ঠিক আছে, আমিও দেখছি, সরস্বতী এরপর বেশ কিছুদিন কেষ্টপুর গ্রামে ঘুরতে লাগল বিশেষ করে শশিবাবুর নির্বাচনী সভাগুলিতে প্রায় সে যেতে লাগল। একদিন শশিবাবু লেকচার দিচ্ছেন, ওমনি সরস্বতী দুষ্ট সরস্বতী হয়ে শশিবাবুর দেহের ভিতর প্রবেশ করল এবং মুখে ভর করল।

দুষ্টু সরস্বতী ভর করার আগে শশিবাবু বলছিলেন বন্ধুগণ, রবিবাবু চক্রান্ত করে এই কেষ্টপুর অধিবাসীর ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি এই গ্রামকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে তিনি কেষ্ট-পুরকে বিকিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আর বিশ্বে পরমাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে আমাকে ভোট দিন। ভিরের মধ্যে রবিবাবুর দলের একদল এজেন্ট বলে উঠল, আপনাকে ভোট দিলে পরমাণু যুদ্ধ কি করে বন্ধ হবে, সেটা বুঝিয়ে বলুন।

অমনি শশিবাবুর দলের লোকেরা হই হই করে উঠল, কে ওই লোকটার রবিবাবুর এজেন্ট। ওকে মেরে ফেলো। ওর ওপর বোমা মারো। বুকে পর পাইপগান ধরে গুলি কর। সমাজবিরোধী সাম্রাজ্যবাদদের দালাল।

শশিবাবু বললেন বন্ধুগণ, শান্ত হোন, উত্তেজিত হবেন না। ওরা হল অসভ্য—বর্বর। এই সময় দুষ্টু সরস্বতী সুযোগ বুঝে শশিবাবুর কণ্ঠে ভর করল! শশিবাবু বলতে লাগলেন, হ্যাঁ অসভ্য—বর্বর। কেষ্টপুর গ্রামের জনগণও অসভ্য, তা না হলে রবিবাবুর মত এক চোরকে কি করে প্রশ্রয় দেয়। সে কি করে নির্বাচনে লড়তে পারে। তার মিটিং-এ লোকজন যায় কি করে? অসভ্য—বর্বর কেষ্টপুরের মানুষ জনতার মধ্যে সবাই শশিবাবুর দলের লোক ছিলেন না। নিরপেক্ষ লোকও ছিল, তারা হই হই করে উঠল। তার মধ্যে অনেকে সভা ছেড়ে চলে গেল, মুহূর্তের মধ্যে সভা পণ্ড হয়ে গেল।

পরদিন রবিবাবুর দলের লোকেরা পোষ্টারে পোষ্টারে সারা কেষ্টপুরকে ঢেকে ফেলল। কেষ্টপুরের মানুষকে বর্বর বলা হয়েছে। গ্রামের মানুষ গর্জে উঠুন। কেষ্টপুরের বুদ্ধিজীবী আছে অনেক যেমন গ্রামে হেডমাস্টার নরেন সাহা, কবি কৃপাসিন্ধু বাকচি, যাত্রাভিনেতা হট্টগোল সেখ, এরা কেষ্টপুর দূত পত্রিকায় রবিবাবুর গুণগান গেয়ে কিছু লিখলেন, রবিবাবুর লোকেরা লিখলেন কেষ্টপুরকে বাঁচাতে গেলে নতুন

নেতৃত্ব চাই সেই নেতৃত্ব দিতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বাগ, তাই আপনাদের উচিৎ রবীন্দ্রনাথ বাগকে ভোট দিয়ে এই গ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিনত করুন।

শশিবাবুর পক্ষের বুদ্ধিজীবিরা বললেন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি শশিভূষণ সিংহকে নির্বাচিত করুন। অযথা শিক্ষিতরা দেশের ক্ষতি করছেন। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের আরও ক্ষতি করছে। উচ্চ শিক্ষা শুধু আমাদের বেকারী বাড়াচ্ছে, তাই তিনি ছোট বেলাথেকে এটা বুঝেছেন বলে তিনি বেশী শিক্ষিত হননি। মাতৃভাষাকে তিনি মাতৃদুগ্ধ বলে মনে করেন। এটি যেমন তার জীবনে পালন করেছেন তেমনি নিজের ছেলেমেয়েদের জীবনেও পালন করিয়েছেন। তাঁর পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে কেউই ক্লাস এইটের বেশী লেখাপড়া করেননি। এর দ্বারা বোঝা যায় তিনি শিক্ষার বিরুদ্ধে।

এর পর যথা সময়ে পুরনির্বাচনের ফলাফল বেরুলো। দেখা গেল পুরসভার সাতটি আসনের মধ্যে রবিবাবু তিনটি এবং শশিবাবু চারটি আসন লাভ করেছেন। রবিবাবু এবং শশিবাবু দুজনেই সমান ভোট পেয়েছেন। এখন তাদের কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে।

ডায়েরীর সেই পাতাখানি

রমাপ্রসাদ চন্দ্র
বি. কম. তৃতীয় বর্ষ
সাম্মানিক বিভাগ
অনুক্রম—১৩

চাদরে মুড়ি দিয়ে সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে ঘাসের আগায় রা শিশিরে ভরা মাঠটাকে দেখে অতীনের ভীষণ আনন্দ হয়। কিছুটা হেঁটে আসে। পা ভিজে য়। কিন্তু হঠাৎ তার মনটা বিষন্ন হয়ে যায়। সে জোরে জোরে আবৃত্তি করতে থাকে Keats-এর কট কবিতার শেষ লাইন কটি : "Day so soon has glided by : /E'en like the ıssage of an angels tear / That falls through the clear other silently "

শিশির, যেন দেবতার চোখে জল। তার পতনের কোনই শব্দ নেই। অতীনের তাই তাকে নুভব করতে পারে। মানুষ জন্মগ্রহণের পর বড় হয়। কিন্তু বড় হয় কিসের হিসাবে ? সময়—যে ময় মিনিট সেকেণ্ড, ঘণ্টা পার করে, দিন শেষের ঘণ্টা বাজিয়ে হয়ে যায় ইতিহাস। পৃথিবীর আবর্তনের বর্তমানকালের বিসর্জন ও নব ইতিহাসের সংযোজন। এই পৃথিবীর হাট! শুনতে আশ্চর্য কিন্তু তবুও এ বাস্তব।

আজ অতীনের জন্মদিন। জন্মদিনের আনন্দের সাজানো অনেক সম্ভার। তবুও ওর বিষন্ন কি এক পুরাতন ইতিহাস নাড়াচাড়া করায় ব্যস্ত। পুরানো দিনের লাভ লোকসানের হিসাবটা মিলিয়ে দেখবার জন্য কোলের উপর টেনে নেয় গত বৎসরের দেওয়া সোনালী রঙের ডায়েরীখানাকে। পুরানো দিনের স্মৃতির মধুময় রোমন্থন আজ তার কাছে স্বর্গ—সুধাময়। ডায়েরীর নীল পাতাগুলোরই স্মৃতি রোমন্থনের সম্ভার থরে থরে সজ্জিত। পাতার পর পাতা উলটে শেষ পাতাটায় তার চোখ আটকে গেল। প্রথমে একটা ব্যর্থতা, একটা চিন চিনে ব্যথা। কিছু অশ্রু।

সেই শেষ দিনটি। একটা ভয়—জয় না পরাজয় ? সাত সতেরো ভাবতে ভাবতে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ অতীনের অনেক বন্ধু, তবু অতীন আজ তাদের এড়িয়ে চলে। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা, তবুও অতীন মরিয়া। আজ তাকে উত্তর নিতেই হবে। তাই সারাটা দিন তার অপেক্ষা।

গৃহবাসী হয়েও যে ফকির, বনে না থেকেও যে বনচর, তেমনি পেয়েও পায়নি, দিয়েও দেয়নি। মন থেকেও ঠাঁই নাই মনে। হাস্যকর কথাগুলো সত্যতার চির কিন্তু ধরাই নি। সত্যতার রূপ দিতে গিয়ে অতীন আজ বয়ে চলেছে ব্যর্থতা। কেন ? —প্রশ্নটা শুধু অতীনের কাছেই নয়। প্রতিপক্ষের কাছেও সমান। যে উত্তরটা ধন্য করত অতীনকে—কিন্তু "করত" এই মন গড়া শব্দে সত্যকেত আর

চাপা যায় না। মামাবাড়ির বিশালতা বিরাট আছে। কতদিন, কতবার, কতক্ষণ যে নিজেকে পরীক্ষিত করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিয়তির শেষ বিচার। ব্যর্থতা আর শূন্যতা। এই ব্যর্থতার পরি-শ্রান্ত আজ ঝুঁকে পড়েছে সজীব।

সজীবের ব্যবহার খুবই ভালো। তার চেহারা ব্যক্তিত্ব যেকোনো যৌবনের মধ্যে [illegible] ছাড়ে না। B. Com. Final Year-এর মেধাবী ছাত্র। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। [illegible] তার আদরের ছেলে কম নয়। একাকীত্বের জীবন তার ভালো মনের দিকেই পরিপূর্ণ। কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে কোথায় একটু ফাঁক ছিল।

কলেজের প্রথম দিনে কলেজ ক্যাম্পাসে ক্লাসের পর বিদায় বেলা [illegible] খুঁজে খুঁজে সেই বিষণ্ণ দিন এক রাতের। কিন্তু আজ কলেজের শেষ দিন। শুধু চাওয়া। পাওয়ার কোনোই সামঞ্জস্য নেই। নিজের বিবেকের কাছে [illegible] নিজেকে বারবারই প্রশ্ন করেছে "আমি কি এতই অযোগ্য?" উত্তর পাওয়ার আগেই [illegible] কলেজের প্রাঙ্গনে সবুজ ঘাসের বুকে।

নীল পাড়ওয়ালা গোলাপী শাড়িপরা [illegible]। কপালে সোনালী টিপ। [illegible] লিপে এক লালিমা। শাড়ি, টিপ, [illegible]। [illegible] সুন্দরের ছবি। কিন্তু সজীবের [illegible]? আলো যে সমস্তই আলোকিত করে, তার নিচে ঘোর অন্ধকার।

[illegible] বাবার বান্ধবীকে [illegible] সজীব। কিন্তু সুখের আনাগোনা [illegible] তার মনের সুখ ঢুকবে কি ভাবে। আবার সুখ কাউকে একমাত্র আলো দান করে না। ফুঁ দিয়ে [illegible] তার বাক ফিরেনা। সজীব [illegible] স্বপ্নের দেখা। কিন্তু ঐ সুখের [illegible]। [illegible] সবকিছু [illegible] সোনালী দিনের স্বপ্নের মাঝে হারিয়ে গেল।

সজীব কলেজে ফর্ম— Fill up এর মাঝে মাঝে তার মনটাকেও Fill up করে নিয়েছে দুঃখ ও ব্যর্থতা দিয়ে। শুধু এই দুঃখ ও ব্যর্থতাই সজীবের সম্পূর্ণ জীবনের মূলধন।

বিদায় বেলার সাথে মিশে যাওয়া পশ্চিমী সূর্যটা যেমন আকাশ জুড়ে [illegible] হয়েছে। [illegible] সেই কোন [illegible]। [illegible] অন্ধকারেরই নির্মম প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।

আলোর রোশনায় এক রাতে [illegible] এক মায়াবী রূপ দান করবে। [illegible] মিষ্টি গন্ধ, [illegible] করছে। বন্ধুদের চিৎকার কোলাহল, [illegible] বন্ধুদের নানা প্রশ্ন। সবাই সজীবকে নিয়ে। সকলেরই একই প্রশ্ন, সজীব আজ কাউকে না বলে কোথায় বেরিয়ে গেল।

সজীব তো, তার এখানে থাকার তো কথা নয়। সেখানে [illegible] ডিসেম্বরের [illegible]

...তার মা হতবাক হয়ে গেলেন। পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে অতীন। ...য়ে লাল আভার দিকে হাত বাড়িয়ে অতীন বলল, 'দেখ মা সূর্যটার না আছে কোন তেজ, না আছে ...লো দেবার ক্ষমতা তবুও কত মনোরম, কত সুন্দর।" রিক্ত, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, সূর্যটা বাড়ী ফেরবার ...র তার কোমল অস্তিত্বের ছোঁয়া দিয়ে প্রত্যেককে জানিয়ে যায় "আমার হল সারা"। সামনে পড়ে ...কা ডায়েরী খানার শীতের হিমেল হাওয়ায় ওলট-পালট করতে করতে ছিঁড়ে যাওয়া কতগুলো পাতা ...ওয়ায় দূর দূরান্তে ভেসে চলে যায়। হয়ত ঐ ছিঁড়ে যাওয়া পাতাগুলির মাঝে অতীনের সেই পাতা-...নিও বহুদূরে হারিয়ে গেল। কোথায়, কেউ জানে না। ডায়েরীর সেই পাতাখানি হয়ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু অতীনের হৃদয়ের ডায়েরীর সাজানো পাতাগুলোর মাঝে ঐ পাতাখানি খুঁজে ...তে কতক্ষণ। মায়ের ডাকে চমক ফিরল। মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে সিঁড়ির প্রতিটি পদক্ষেপ পেরিয়ে অতীন নীচে নেমে এল।

—o—

দাগ

গৌতম সাধুখাঁ

প্রাক্তন ছাত্র

কলকাতার নামজাদা থিয়েটার মঞ্চের মহাভিনেতা অঞ্জন বোস, লেখক হিসাবে ততটা প্রতিপত্তি অর্জন করতে না পারলেও এখনই বেশ ধন ও জনের অধিকারী।

তবুও আজও সে কিন্তু সেই ১৯৭৫—৭৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী অনার্সে পড়ার সময় কার সোনালী দিনগুলোর স্পষ্ট ছবি এখনো সে ধরে রেখেছে মনের মধ্যে পরম যত্নে, মমতায় বা অন্যদিক দিয়ে আশাতেও বলা যেতে পারে।

ঐ কলেজের ইতিহাসে অনার্সের ছাত্রী ছিলেন কাকলী সেনগুপ্ত, বাবা লণ্ডনের Export Import Officer, বাড়ীতে বড় দাদা ও মায়ের পরম মমতা ও আদরের একমাত্র মেয়ে কাকলী।

তারই ভালোবাসার দৃষ্টিতে পড়ে গেল এই লাজুক স্বল্পভাষী সুদর্শন যুবক অঞ্জন বোস। এই বিষয়ে যদিও অঞ্জনের অমত ছিল না তবুও পড়াশুনার চাপ তার, মানসিকতাকে এমন এক উঁচুতারে বেঁধে রেখেছিল যেন প্রেম করার মত অবসরটুকু সে পাবে কিনা তাতে তার নিজেরই সন্দেহ ছিল।

তবুও বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে এক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে পরিচয় ঘটল তাদের। দিনটি ছিল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন। এবং তারই মধ্যে কখন যেন ওরা দুজনে-দুজনেই একটু একটু তলিয়ে গেল পরস্পরের প্রতি প্রেমের গভীরতায়। ঐ দিন অঞ্জনের খুবই স্পষ্ট মনে আছে ওর 'হ্যালো'

সম্ভাষণের উত্তরে কাকলী বলেছিল 'হাউ মাচ লাভলী টু মিট ইউ'। পরে অনেক রকমের কথা, আলোচনার কিন্তু শব্দ ও উচ্চারণে একপাটি প্রকাশ ভঙ্গি ও যুক্তির মধ্যে কাকলী জয় করে নিয়েছিল অঞ্জনকে। ঘন নিবিড় সুন্দর একটি বাক্য অঞ্জনের মনকে যেন কোথায় তলিয়ে নিয়ে গেল।

বন্ধুদের মধ্যে বসে অঞ্জন ও কাকলী গল্প করতে করতে হঠাৎ কাকলীর নজর পড়ল অঞ্জনের হাতের ডায়েরীর দিকে। ডায়েরীর পাতা উল্টাতেই কাকলী বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল অঞ্জনের একটি পাকা হাতের ছবি। ছবিটার মধ্যে দিয়ে অঞ্জনের একটা একাকিত্বের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কাকলী সেটা বুঝেছিল।

যদিও তখনই দুজনের মধ্যে মেলামেশায় খুবই আড়ষ্ট ছিল কিন্তু তারা যেন প্রেমের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিল তাদের মনের তরীকে।

এরপর একদিন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে কাকলী একদিন সিনেমার দেখতে যাবার প্রস্তাব করল। অঞ্জন অবশ্য সিনেমার এবং যাত্রা নাটক ভালই পছন্দ করে, ফলে মতানৈক্যের কোন প্রশ্নই উঠল না। দিন ঠিক হলো। আগামী শনিবার বেলা ১০টার শো। কাকলী তার দুই বন্ধু পাপিয়া ও সোমাকে বলে রাখল, এবং অঞ্জনও তার একমাত্র বন্ধু পার্থকে বলেছিল। সকলে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করল।

শনিবার সকালে কাকলী ঘুম থেকে উঠেই তাদের নিজের ড্রাইভার রতনদাকে বলে রাখল। সকাল-সকাল স্নান খাওয়া সেরে, কাকলী ৮টার মধ্যে ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করল।

মাথায় আষাঢ়ের মেঘের মত কালো চুল, আর আসমানী রঙের শাড়ী ও ব্লাউজের সঙ্গে একটু সুন্দর লাগছিল নিজেকে। তারই আনন্দে নিজের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জনের কথা চিন্তা করছিল আর মনের আনন্দে মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনছিল

এমন সময় হঠাৎ ক্রিং ক্রিং ক্রিং শব্দে তার ড্রেসিং রুমের কলিং বেলটি বেজে উঠল, বেরিয়ে দেখল তার বন্ধুরা সকলে এসে গেছে। মাকে বলে, ট্যাক্সি করে, কাকলী ও তার বন্ধু হলে এসে পৌঁছাল। তখন সকাল ৯-১৫ মিঃ। তখন অবশ্য অঞ্জন ও পার্থ এসে পৌঁছায়নি। চারপাশে তাকিয়ে অঞ্জন ও পার্থ কাউকে দেখতে পেলনা তারা। প্রধান দরজার ভিতরে ঢুকে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল ওরা অপেক্ষায়। তিনজনই মেয়ে তাই কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করছিল ওরা। সোমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা ১০টা বাজে। তখন ওরা ব্যাকুল হয়ে রাস্তার অপর পাশে পথচলতি পুরুষগুলোকেই নিরীক্ষণ করছিল।

মনে মনে অধৈর্য্য হয়ে উঠল কিন্তু প্রকাশ করার উপায় কোথায়? শেষে যখন ১০-৫ বাজে তখন ভদ্রতার সুযোগ রক্ষার্থে পাপিয়া আরও ৫ মিনিট অপেক্ষা করল অঞ্জনের জন্য।

অঞ্জন ও পার্থ পাগলের মত গাড়ি চালিয়ে আসছে, এমনকি ঘড়ির দিকে তাকাবার মত সাহস তাদের নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি লাল রঙের মটর বাইক এসে পৌঁছাল হলের সামনে।

প্রথমেই অঞ্জনের সম্ভাষণ 'অ্যাম সাউ সো সরি' কাকলী পাপিয়া সোমা। তারা অবশ্য সকলেই

তার দুঃখিত হবার কারণ অস্বীকার করে ধন্যবাদ জানাল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা হলের মধ্যে প্রবেশ করল। তখন অবশ্য শো আরম্ভ হয়ে গেছে। থিয়েটার ও অভিনয় প্রিয় অঞ্জন অবশ্য সেই থিয়েটারের হলে, সেদিন সে তার দু চোখ ভরে কাকলীর সেই মনমোহিনী মুখশ্রীর দিকেই চেয়েছিল।

থিয়েটার শেষ হবার সাথে সাথে তারা রেষ্টুরেন্টে জলযোগ সেরে বাড়ি ফিরল। কিন্তু কাকলী বাড়ি এসে শুনল লণ্ডন থেকে আসা তার বাবার টেলিগ্রামের কথা। তার বাবা অসুস্থ। তাঁর পরিচর্যার জন্য কাকলীকে যাবার কথা লিখেছেন। নিজের মতের বিরুদ্ধে, মা ও দাদার অনুরোধে এবং কর্তব্যের খাতিরে কাকলী লণ্ডন যাবার সিদ্ধান্ত নিল। তার সঙ্গে যাবে বাড়ির একজন বিশ্বস্ত চাকর ও কাকলী একটি লেডি পরিচারিকা। যাওয়ার দিন ঠিক হল আগামী বুধবার। কাকলী অঞ্জনকে জানাল, এবং বিমান বন্দরে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলো অঞ্জন। ক্লান্ত মনে ফিরে এলো অঞ্জন, নেহাত মনের বিরুদ্ধে সম্মতি দিয়ে চুপচাপ মন খারাপ করে রইল।

ওদিকে কাকলী লণ্ডনে গিয়ে দেখল পিতা মৃত্যুশয্যায়, তাকে সেবা করছে পিতার গৃহভৃত্য হারাধন কাকা। এবং পিতা অফিসের P. A. একজন ইংল্যো যুবক। সুদর্শন এই যুবক, বয়স ত্রিরিশের মধ্যে দোহারা চেহারা। যুবকের নাম মিঃ ডেকা। এই ইংল্যো যুবককে নিয়ে কাকলী মনে মনে গড়ে তুললো এক স্বপ্ন-এর স্বর্গ।

মিঃ ডেকাও অবশ্য সুশ্রী বাঙালী যুবতী কাকলীর মনহরিণীরূপে অভিভূত হয়েছিলেন। ক্রমে কাকলীর পিতা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন মিঃ ডেকা, কাকলীর পিতার কাছে, কাকলীকে তার জীবন সঙ্গীনী করার বা বিয়ে করার কথা প্রস্তাব করলেন। যদিও এতে কাকলীর আন্তরিক মতামত আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রস্তাবে কাকলীর পিতা অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে মত দিলেন। কারণ মিঃ ডেকা, উচ্চ শিক্ষিত ধনী, সুদর্শন—এক কথায় তার পিতার মতে কাকলীর জন্য যেমন পাত্রের প্রয়োজন মিঃ ডেকার তার কোনটারই অভাব নেই। কলিকাতায় এসে তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ কার্যাদি সম্পন্ন হবে মিঃ ডেকা নিয়ে শ্রীসেনগুপ্ত অর্থাৎ কাকলীর পিতা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এবং ডেকার সঙ্গে কাকলীর বিবাহে স্ত্রী ও পুত্রের পূর্ণ সমর্থন পেলেন শ্রীসেনগুপ্ত।

কিন্তু কাকলীর সেই কলেজ প্রেমিক অঞ্জন আজ অত্যন্ত আশাতেই সেই দিনগুলোর কথা মনের মধ্যে পরম যত্নে গেঁথে রেখেছে। অভিনেতা অঞ্জন বোস আজও কিন্তু ধন, দৌলত, যশ-প্রতিপত্তি অনেক কিছুরই অধিকারী কিন্তু কাকলী সেই মনমহিনী রূপ, পটোল চেরা দুটি চোখ, নিটোল দুটি ঠোঁট আজও অঞ্জনের রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সে কিছুক্ষণ খুঁজে পায় কাকলীকে আবার যেন কোথায় হারিয়ে ফেলে।......

কলিকাতায় ফিরে এসে মিঃ ডেকার অনুরোধে কাকলীও তার দাদা সন্ধ্যার শো'তে থিয়েটার দেখতে যাবার মনস্থ করল। রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে, বইয়ের নাম অমরকথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'।

মিঃ ডেকা, কাকলী ও তার দাদা রংগনায় পৌঁছালেন, হলে প্রবেশ করে সিটে বসে ডেকা ও কাকলীর দাদা গল্প করতে লাগলেন। কাকলীর কিন্তু……

সেই চার বছর পূর্বেকার পূর্বস্মৃতি মনের মধ্যে বিচরণ করছিল। এরই মধ্যে অভিনয় শুরু হয়ে গেল। এক সুন্দর রোমান্টিক প্রেমাভিনয়। বইয়ের নায়ক দেবদাসের ভূমিকায় অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে কাকলী তার পাশে বসে থাকা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা দাদা যিনি বইয়ের নায়ক তাঁর নামটা ?—

হাঁ, উনিই হচ্ছেন বর্তমান কলিকাতার থিয়েটার মঞ্চের নামজাদা মঞ্চাভিনেতা অঞ্জন বোস। কাকলীর প্রশ্নে ভদ্রলোকটি বললেন।

অঞ্জন ··অঞ্জন ··অঞ্জন বোস—নামটা যেন কাকলীর মনে বারংবার প্রতিফলিত হতে লাগল। এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়ে সোনালী দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতে লাগলো। ভেসে উঠল কাকলীর চোখে, অঞ্জনের ডায়েরীতে অঞ্জনের সেই পাতাজোড়া ছবিটির কথা, একাকিত্বের ভাব। মনে পড়ে গেল ষ্টারে পাশাপাশী বসে থিয়েটার দেখার কথা।

মনে পড়ে গেল লণ্ডন যাবার পথে, বিমান বন্দরে কাতর কণ্ঠে অঞ্জনের বিদায় সম্ভাষণ যে প্লেস ইয়োর ষ্টার্টিং কাকলী।

এই সমস্ত পূর্ব স্মৃতি যখন কাকলীকে উন্মাদিনী করে তুলেছে ঠিক তারই ফাঁকে রংগনা রংগমঞ্চের কালপর্দা পড়ে গেল।— অভিনয় শেষ।

হলে থেকে বেরিয়ে কোন রকম চিন্তার অবসর না করে কাকলী দাদাকে বলল তোমরা যাও আমি যাচ্ছি। কাকলী দ্রুত গ্রিনরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

একটি স্বপ্ন

প্রশান্ত নন্দ বি-কম (পাশ), প্রথম বর্ষ রোল নং—১৬০

'আয় মা, তোকে কত দিন দেখিনি। ছিলি কোথায়?' আরতো পারিনা মা—কথাটা শেষ হতে না হতে নাতনী বলে উঠল দাদু-দাদু এই দেখো আমার খেলনা, আমার বাবি কিনে দিয়েছে। তুমি যেমনটি দিয়েছিলে তেমনটি। 'দাদু' ডাকটা শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে একটা চুমু দিতেই, নাতনিও একটা হাসি আমায় দিল। দাদু তুমিতো অনেক গল্প জানো তাই-না? ঘোর পাগলী মেয়ে! গল্প জানি কে বলে? মা বলে যে আমায়—'তুমি নাকি এক রাজকুমার পক্ষিরাজে চেপে'…। না আমি কোন কথা শুনবো না, 'তুমি আজ আমায় একটা গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে। আমি এই শুলাম—।

নাতনী-কে কাছে পেয়ে মনে পড়ে যায় অতীতের কথা, আর চিন্তা করি বর্তমান অবস্থার কথা। সব থেকেও আমার কিছু নেই। আমি যে এক সর্বহারা বসন্তের কোকিল। কোকিল যেমন বসন্তকে পেয়ে তার গান শুনায়। তেমনি আমিও শুনাতে চাই আমার অতীতের কথা—

আজ থেকে ৯ বৎসর পূর্বে জ্যোৎস্নাবিধৌত নিস্তব্ধ রাত্রি। চারিদিক ঝলমল করছে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়। হঠাৎ কোথা থেকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে মুছে দিল জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যকে। জানি না কোন অভিশাপে ঘটেছিল এই ভয়াবহ দুর্যোগ। সেই রাত্রিতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লোকায়িত অঞ্চলটি শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। ঝড়-জল সমুদ্র-জলোচ্ছাসে অংকের মধ্যে একটা তাণ্ডব শুরু হয়। এমন সময় আমি সকল কিছু ছেড়ে প্রাণের ভয়ে দৌড়াচ্ছি। পথি মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়ের করুণ কান্নার শুর ভেসে আসছিল। আমি লক্ষ করে গিয়ে দেখি মেয়েটি তার মা ও বাবার বুকের উপর শুয়ে কাঁদছে। চারিপাশ থেকে ভেঙে পড়ছে বাড়ির অংশ। এমতাবস্থায় ছিনিয়ে নিলাম মেয়েটিকে। পড়ে থাকলো মা ও বাবা।

নব প্রভাতের সূর্যোদয়ে চারিদিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাত্রি নেই, সকাল নেই, শুধুই হেঁটে চলেছি প্রাণের দায়ে। শুধু আমরা নয়। পেছনে সামনে চলেছে অগণিত মানুষ, যারা উদ্বাস্তু।

কটা বাজে কে জানে? খুব খিদে! মেয়েটি কাঁদছে। কিন্তু উপায় নেই। হাত যে নিঃস্ব। চলছি এমন সময় পথের পাশে একটা বাড়ির জানালা থেকে ভেসে এলো রেডিও-র শব্দ। মনে হল যদি খবর হয়। হ্যাঁ—তাই—! আকাশবাণী কলকাতা খবর পড়ছি প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হল বাংলা দেশে এক প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের ফলে ৩০০০-এরও বেশী, ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং বহু গাছ ভেঙে পড়েছে। মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০০০। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ১৫০ কিমিঃ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আজ মস্কো—ভাবতে লাগলাম হায়! এই মেয়েটির মত আরও কত সন্তান হারালো তার পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন আমিই-তো ছেড়ে

এসেছি আমার পরিজন বর্গকে। জানিনা তারা এখন কোথায় কেমন আছে।

অবশেষে আমরা আশ্রয় নিলাম ফুটপাতে। ফুটপাতের জীবন বড় কষ্টকর। রোজ খাওয়া জুটাতে পারতাম না। কোন দিন বা একখানা পোড়া রুটি, কোন দিন বা এক-মুঠো চালের খুদ খেয়ে দিন কাটাতাম। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। মেয়েটিকে সামান্য খেতে দিতে পারি না। কি কোরব উপায় নাই। কাজ করিবার ইচ্ছা থাকলেও কাজ পেতাম না। রৌদ্রের তাপ দাহ যেমন ধরণীকে শুকাইয়া দেয়। তেমনি খিদের জ্বালা আমাদের কুরে কুরে খেতে লাগল। আমি আর থাকতে না পেরে বেড়িয়ে পড়লাম রাস্তায়। কিন্তু কি হবে— কাজ কে দেবে—কেউ নয়। এমন সময় এক বিয়ে বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলাম দেখলাম বাড়ির চ করটি এঁটো খাবার কিছু ফেলে দিতে আসছে। চাইলাম! কিন্তু দিলে না। বললে, চল্-চল্-শালা খেটে খেতে পারিস না। ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিল। আমি লোভ ছাড়তে পারলাম না। গেলাম ওখানে কিন্তু অনেকগুলো কুকুর ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে তারমধ্যে। আমিও একটা হাত পুরে দিলাম তার মধ্যে, কিছুটা নিয়ে যখন হাতটা বার করব, এমন সময় হাতের উপরে পড়লে এক কামড়। কিন্তু খাবার ছাড়লাম না। বাড়ি ফিরে দেখি মেয়েটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। বললাম, মামনি দ্যাখ খাবার এনেছি। অমনি ওঠে বললে খাবার এনেছো? দাও না! সে খুব আনন্দ করে খেল। আর বললে—বাবা কত দিন এরকম খাবার খাইনি বল? খুব সুন্দর তাই না?

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আমার চোখ দুটো তখন ভরে গিয়েছিল শুধু জলে। এর পর না, তার জ্বর হল। ক্রমশ জ্বর বাড়িতে লাগিল চোখ মেলতে পারে না শুধু প্রলাপ বকছে। বলছে, বাবা আমি ভালো হয়ে যাবো, তাই না? আমি তখন লেখাপড়া করব। কত বড় হয়ে যাব!

পয়সার সন্ধানে বেরোলাম। এক জায়গায় দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা 'well come', আমি মনে করলাম কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। বাইরে থেকেই Musick-এর শব্দ শুনা যাচ্ছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই শুনতে পেলাম একটি মেয়ে গাইছে 'I am a disco dancer' আর কিছু যুবক Drink করে নাচছে আর বলছে I lave you, I love you. আমি আমার দুরাবস্থার কথা বল্লাম। বাবুরা বললে এটা সাহায্যের জায়গা নয়। Distrubs কোর না। চলো চলো। কিছু পেলাম না। চলে এলাম অবশেষে এক ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়ে খুব করে অনুনয় বিনয় করার পর সুরাহা হল। ডাক্তার বাবুর সাহায্যে আমার মামনি আবার ভালো হয়ে উঠল।

মামণি এখন ভালোই বড় হয়েছে শাস্ত্র জ্ঞানও জন্মেছে। আর শুধু বসে বসে আর খেতে চাই না। তাই সে অনেক খোঁজ করে এক বাবুর বাড়িতে বাসন মাজার কাজ নিল।

বাবু ছিল খুব ধন ব্যক্তি এবং হাতে তার বেশ কিছু যুবক ছেলে ছিল। তারা তাঁহার আদেশ মেনে চলত। এঁদের জোড়েই বাবুর জোড়।

একদিন দেখা গেল মামণির কুসুম কোমল দেহটি বাবুর বাড়ির পাশের ডোবায় ভাসছে। বাবুর মুখ থেকে শুনা গেল স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়াছে। অর্থের জোরে ঘটনাটা সাময়িক চাপা পড়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল বাবু ও বাবুর দল তার উপর অন্যায় অবিচার করে এব তাকে গলা টিপে হত্যা করে জলে ফেলে দেয় এমনি করে ঝড়ে গেল একটি ফুটন্ত ফুল।

রাত্রিতে ওঠে দেখি দাদু ঘুমাচ্ছে আর স্বপ্নের আবেগে বলছেন—মামণি তোর মান রক্ষা করতে পারলাম না । আমি গল্পটা সম্পূর্ণটা শুনিনি, কারণ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই আমি জানিনা কেন দাদু স্বপ্নের আবেগে ঐ কথা বলছেন।

শারদীয়/যুগল সারথি পত্র/বাংলা আসাম', ৩৫ বর্ষ।

মন কেমন যেন আলগা আলগা হয়ে যাচ্ছে। সময়ের যানি চলছে ফিরছে দেখাচ্ছে। চারতীর্থ গমন। গোলমাল নাকো ঝোমমেকার। মুখে মুখে মিশছে মিশছে চলছে। অশান্তির সংসার। গোলমালের চাকার ছিঁড়ছিঁদ দেখো। ইলেকট্রনের অণু। এ দিয়ে আর কদিন চালাবো! সংসার চলছে নাকো সামলাইন চলছে। মন শক্ত। মন শক্ত। দুই ছেলে যা ছেঁড়োর হল। ওদের দেখলেও ভয় লাগে। মরণ যোগীর সামনে যেন অভিজ্ঞান আনছে। মন খারাপ হল। ভাঙাচোরা গেল। এসব থাকুক, আমি কে? কে আমার। মন খুঁজি তাই। জানিনা জানিনা যেমনই দেখাবো। বিসর্জন করলাম যেমনই আনলাম. চারতীর্থ শেষ. ঘনশ্যাম শেষ।

ঘনশ্যাম বাবু মোর করুন অবস্থায় আর্থিক কারো কোন আশা-ভরসা নেই। যে যেদিকে পারছে ঠিক করছে। জল বিঁধছে। স্ত্রী বাসন্তীও মন আজকাল স্বামী ঘনশ্যামকে মোটেই সহ্য করতে পারছেন না। তাঁর উপর মেজাজ সবসময় খিঁচড়ে থাকে আগুনের মত গনগনে করে ফুটছে। ঘনশ্যাম ও তাঁর ইদানীং আর ব্যবহারে খিটখিটে, তত করে মুখ লাগাচ্ছে। সংসারে অশান্তি। পলি আমার ওষুধটা, খেলটা খেলে? চাইতে চাইতে সে গলার শিরগুলি ফুলে গেল। ঘনশ্যামের কথায় বাসন্তী কোন কান দেয় না। চুলোয় রুটি সেঁকতে সেঁকতে মেয়ে পলিকে বলে, যা তো একটু দিয়ে আয় তো! পলিও কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। থাকুক বাবুক, পারেতো নিয়ে যাক।" কথাগুলো বলতে বলতে রুটি সেঁকতেই থাকে। বারান্দা খোলা বারান্দায়। কোন মতে চট দিয়ে ঘিরে ওখানেই বাসন্তী রান্না করে। সামনে টিপটিপ করে আগুন জ্বলতে থাকে। চুলোয় একটা কাঠ ঠেলে ঢুকোয়। কাঠের আগুনে বাসন্তীর মুখ লাল দেখায়। একরাশ আগুনের ফুলকি ছাই হয়ে উপরে উড়তে উড়তে উড়তে বাসন্তী আর পলির মাথায় এসে পড়ে। বাসন্তী পলির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। পলির বয়স হচ্ছে। পোশাক ও ঘনশ্যাম ভাল দিতে পারে না। মাত্র একটা লাল রঙের ছেঁড়া কাপড় পড়ে জবুথবু ভাবে বসে রুটি সেঁকতে থাকে। গায়ে চাদর নেই। বাসন্তীর দেখে কষ্ট লাগে। ভাবে, ওর একটা গতি হল না। আর কদিন আইবুড়ো থাকবে। চেহারাটা শুকিয়ে অযত্নে কাঠি হয়ে যাচ্ছে। খোঁপা কেউটের মতো সাপের রং। কপালটায় তেল না থাকায় নিভু নিভু হয়ে যায়। পলির মুখটা নিষ্প্রভ আলোয় দেখতে দেখতে বাসন্তী আঁতকে ওঠে। ঘনশ্যাম এই যে! এই যে! কাণ্ড দেখো ঠাণ্ডু কুলাঙ্গারটা আবার সিগারেট খেয়ে ঢুকেছে। ছেলের চিৎকারে পলি রুটি সেঁকতে সেঁকতে উঠে আসে। বাসন্তীর কাছে ছেলের এই মাতলামি অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার উপর একবার উঠলে ঠাণ্ডুর রাগ কথায় কথায় ঘনশ্যামের উপর ফুলছে। এই সংসার বিচানি আর ভাল লাগে না। বাসন্তী একথা বোঝে বলেই আর উঠল না। পলি সামনের ঘরে আসতেই দেখে ঠাণ্ডু খাটের উপর সটান হয়ে পড়ে রয়েছে। ঠাণ্ডু ওর চেয়ে তিন বছরের ছোট। তবুও ও একটু মা ভয় করে তা এই নিরিখে। মা বাবা বোবাই কেয়ার। ঘনশ্যাম তো ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। নস্যির ডিব্বাটা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে নিমিষে বারান্দায় অন্য ঘরে চলে যায়। কেন? কেন? হাতটা জ্বালাতে এত কেন তুমার? কেন? কেন! এখন তোর মাতাল বন্ধুগুলো কাটালি না কেন? সিগারেট খর জ্বালাচ্ছিস।

আইবুড়ো রাখবে নাকি ? এখনো বিয়ে দিচ্ছো না ? পলির কোন কথায় যেন ঠাণ্ডুর কানে ঢোকেনা। গোঙাতে থাকে। পলিও আর ঠেকাতে পারে না। বুক ধরফর করে ওঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে কেঁদে ফেলে। সংসারে ঐ বৈর্য্যশীলা ঘনশ্যাম কোনদিন না ঠাণ্ডু না ছোট্টু কাউকেই একটা বে করেনি। হবে-ই-তো-হবেই-তো যেমন বাপ তেমনি বেটা। নে নে পলি এখন কুঁজা বেটা। বাসন্তী কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে রে রে করে বলে উঠল। সেইখান থেকে পলি এনা বোকতে বোকতে হাঁপিয়ে গেছে দেখে ঘনশ্যাম ঘরে প্রবেশ করতেই দেখে রণমূর্তি ধারীনি বাসন্তী। বাসন্তী একটা হুঙ্কার ছেড়ে বলল, এই যে এই যে! যাচ্ছো কোথায় ? এবার ছেলেকে কিছু বল। এতদিন-তো চাকরী করে কাটিয়েছো এখন বাড়ি আছো। কত দিন তো বলেছি তা-গো ছেলে যে অধঃপাতে গেল। গেবুদের আড্ডায় যাচ্ছে। তোমার তো কোন হুশ জ্ঞান বলে কিছু নেই। শুধু এড়িয়ে গেছো। বেশ তো এখন ছেলেদের নিয়ে থাকো। আমি পলিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চললাম। ঘনশ্যাম বেগতিক দেখে এগিয়ে আসে এবং বলে- আরে শোনো! শোনো! কথা আছে। কথা! আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ঢুকেছি পলির জন্য একটা পাত্রের সন্ধান নিয়ে। বাসন্তী রে-রে করে ওঠে, আমি জানিনা যাও। তুমি যা পারো তাই করোগে যাও।

ঘনশ্যাম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরে বাপরে বাপরে বাপ। সংসারে সব শত্রু। কার সাথে কথা বলবো ? কেউ কথা শোনে না। যখন চাকরী ছিল তখন তো হাটের কাছিমের মতো চাভিয়ে ছড়িয়ে খেয়েছো। এখন হাড় কটা আছে বলে মনে ধরছে না না! না! পলি তুই একটা বিহিত কর। তোর মা যদি প্রতিকূলে চলে তবে কিইবা হবে!

বাসন্তী চুলোয় একটা কাট ঢুকিয়ে আবার ফিরে আসে সংসারটাই যেন চুলো। দুই ছেলেতে যেন আগুন ধরিয়েছে। রক্ষা নেই পলি, তোর বাবাকে বল আগে টাণ্ডুকে বার করতে তবে কথা হবে।

ঘনশ্যাম—বেশ তাই করছি। আরে হারামজাদা। জানোয়ার শুয়োর দূর 'হ'। এদিকে পলি হাও মাও করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওমা ঐ দেখো ছোট্টু চটের কাছে দাড়িয়ে। দেখছো! দেখছো! সংসারটা হল কি। মদের বোতল। এইসব ছেলেদের কুঁজা দিয়ে খাওয়াতে হয়। বাসন্তী একবার এঘর একবার ও ঘর করতে থাকে। পলি শান্ত হয়ে একবার মাকে একবার ঘনশ্যামকে থামাতে থাকে। ছোট্টু ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে মার পা-টা চেপে ধরে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। প্যান্টের পকেট থেকে পনেরো হাজার টাকা বার করে মার হাতে দেয়। ঘনশ্যাম সমস্ত ব্যাপারটা দূর থেকে দেখতে থাকে। ওরে বাপরে বাপরে বাপ। আজকাল ডাকাতি করতে শিখেছিস ? দেখো বাসন্তী খবরদার ছোবে না। বুড়ো বয়সে হাজত খাটতে যেয়োনা।

হোল কি! হোল কি! সব রাহু গ্রাস করছে। ছোট্টু কিন্তু অন্যদিনের মতো আজ মোটেই নেশা করেনি। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে। ছোট্টু মার পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে সত্যি বলছি মা। আমি মদ গিলিনি। বাসন্তী ঠাণ্ডুর উপর ষোলানা রাগ থাকলেও ছোট্টুকে ওতোটা করে না। ছোট্টুর হাত ধরে বলে, কোথায় পেলি এতোগুলো টাকা। এতো টা কাতো তোর বাবা রিটায়ার হয়েও পায়নি।

ছোট্টু—আজ আমাকে ক্ষমা কোরবে মা। এতোদিন কত জ্বালিয়েছি! কিন্তু আজ জীবনের একটা সুরাহা করে নিতে পেরেছি। ঘনশ্যাম ছোট্টুর কথায় একটা আশার আলো দেখতে পায়। বলে,—বাবা এই পনের হাজার টাকা দিলাম এতে দিদির জন্য ঐ পাত্রটাকে ঠিক করো। পলি ছোট্টুর কথায় আকাশ থেকে পড়ে। বলে, ভাই কোথায় পেলিরে এতোগুলো টাকা ? ছোট্টু আবেগ রুদ্ধ গলায় বলল, পাঁচ মাস যে হলে 'শত্রু' চলছিলো। ওরই ব্ল্যাক করে।

একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, মা আমি আর কোনদিন ও ব্ল্যাক কোরবো না। আর যা টাকা আছে একটা থামস্ আপের দোকান কোরবো। দাদাকেও সৎ পথে আনবো। ঘনশ্যাম এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল। আনন্দে ছোট্টুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বলল, আরে ছোট্টু এমন ভাবে তোদের মতো ছেলেরা দাঁড়ায়-তো তাতে সকলে খুশিই হবে। এবং হলে যদি এরকম আর্ট ফিল্ম আসে তবে ঘরেও আর্ট ফিরবে।

(আশি)

॥ শান্তিপুর কলেজ অধ্যাপক মণ্ডলী ॥

অধ্যক্ষঃ—ডঃ চূনীলাল কীর্ত্তনিয়া, এম-এস-সি, পি এইচ-ডি

ইংরাজীঃ—শ্রীপ্রশান্ত বাগচী, এম-এ ২) শ্রীঅশোক কুমার বসু, এম-এ (ডব্‌ল)

বাংলাঃ—১) শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার হালদার, এম-এ-এল, এল-বি

২) ডঃ সলিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি

৩) ডঃ প্রসূন কুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি,এইচ-ডি ৪) শ্রীশঙ্কর সোম, এম-এ

অর্থনীতিঃ—১) শ্রীসুধীরেন্দ্রমোহন কর্মকার, এম-এ ২) শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম এ

৩) শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, এম এ (আংশিক)

৪) শ্রীশঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম এ (আংশিক)

রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞানঃ—১)—শ্রীআকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ২) শ্রীসুনিলবরণ বিশ্বাস, এম-এ

ইতিহাসঃ—১) শ্রীশঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, এম-এ ২) শ্রীসলিল কুমার দাসগুপ্ত, এম-এ এল, এল-বি

৩) শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, এল-এল-বি

৪) শ্রীমতী ব্রততী সেন, এম-এ

সংস্কৃতঃ—১) ডঃ উমেশচন্দ্র দাস, এম এ, পি-এইচ-ডি ২) শ্রীবিমল কুমার গোস্বামী, এম-এ

দর্শন ও তর্কশাস্ত্রঃ—১) ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ ২) লীলা মণ্ডল, এম-এ, পি-এইচ-ডি

বাণিজ্যঃ—১) শ্রীমীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-কম ২) শ্রীবিপ্লব দাশগুপ্ত, এম-কম

৩) "দেবব্রত ভট্টাচার্য, এম-কম এল-এল-বি

৪) "সর্বদর্শন চক্রবর্ত্তী (ব্যানার্জী), এম-কম, এল-এল-বি

৫) "হীরালাল কীর্ত্তনিয়া, এম-কম (আংশিক) ৬) শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস, এম-কম (আংশিক)

গণিতঃ—১) শ্রীসুধীররঞ্জন চৌধুরী, এম-এস সি ২) খোন্দকার আবদুস সালাম, এম-এস সি

৩) "অসিতরঞ্জন সেন, এম-এস-সি ৪) "রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এম-এস-সি

৫) "রত্নেশ মিশ্র, এম-এস সি

পদার্থবিদ্যা—১) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এস-সি

২) "বিমানবিহারী মণ্ডল অধিকারী, এম-এস-সি

৩) "শিশির কুমার সাধুখাঁ, এম এস সি

৪ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, এম এস সি

৫) "মদনমোহন সামন্ত, এম এস সি ৬) শ্রীঅপূর্ব রায়, এম এস সি

৭) অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, এম এস সি

৮) "সুশান্ত মোহন রায়, এম এস সি

রসায়ন শাস্ত্র : ১) ডঃ রেবতীমোহন রায়, এম-এস-সি, পি-এইচ-ডি
২) " অমূল্য মণ্ডল, এম এস সি, পি-এইচ-ডি
৩) " প্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এস-সি, পি-এইচ-ডি
৪) শ্রীসুভাষচন্দ্র সামন্ত, এম-এস-সি

জীবন বিদ্যা : ১) শ্রীচয়ন ভট্টাচার্য, এম-এস-সি
২ " অসীমকুমার পাল, এম-এস সি

শারীর শিক্ষা : ১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এম-এ, ডি-পি-ই

॥ শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ॥

১। শ্রীনিখিল চন্দ্র ঘোষ—প্রধান করণিক
২। " নিরঞ্জন প্রামাণিক—হিসাব রক্ষক
৩। " অমিতাভ গোস্বামী, এম-এ—ক্যাশিয়ার
৪। " প্রভাত কুমার বিশ্বাস, বি-এ—সহকারী গ্রন্থাগারিক
৫। " সাগরময় অধিকারী, এম-এ, বি-লিব, এস-সি—গ্রন্থাগারিক
৬। " অনিমেষ মুখোপাধ্যায়—করণিক
৭। শ্রীমৃগাঙ্ক চক্রবর্তী, বি-কম—করণিক
৮। শ্রীদুলালচন্দ্র মোদক—করণিক
৯। " অজয় প্রামানিক, বি-এ—করণিক (আংশিক
১০। মহম্মদ নূর ইসলাম—করণিক
১১। " মুকুল খাঁ, বি-এস-সি—প্রয়োগশালা সহকারী
১২। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী, বি-এস-সি বি-এ, এল-এল-বি—সিনিঃ প্রয়োগশালা সহকারী
১৩। " কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী—সহকারী কর্মচারী
১৪। শ্রীরণব্রত সিংহ, বি-এস-সি—প্রয়োগশালা সহকারী
১৫। " শচীন ঘোষ—সহ-কর্মচারী
১৬। " কাজল চক্রবর্তী—সহ-কর্মচারী
১৭। শ্রীরাধারমন প্রামানিক—সহ-কর্মচারী
১৮। " প্রভাস কাষ্ঠ—সহ-কর্মচারী
১৯। " বিশ্বনাথ কুণ্ডু—সহ-কর্মচারী
২০। " সাধন ঘোষ—সহ-কর্মচারী
২১। শ্রীঅশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় সহ-কর্মচারী
২২। শ্রীফুলা রায়—সহ-কর্মচারী
২৩। শ্রীসরযু রায়—সহ-কর্মচারী
২৪। শ্রীসোনেলাল রায়—সহ কর্মচারী
২৫। শ্রীপ্রবীর কুমার রায়—সহ-কর্মচারী
২৬। শ্রীশম্ভু বাহাদুর রায়—সহ-কর্মচারী
২৭। শ্রীসনাতন আশু—সহ-কর্মচারী